ভাবনগর
BHĀBANAGARA

PEER-REVIEWED

INTERNATIONAL JOURNAL OF BENGAL STUDIES

VOLUME 19 • NUMBER 23 • JUNE 2025

Bhābanagara, the international journal of Bengal Studies, is a peer-reviewed journal published twice a year by the Vabnagar Foundation. The journal publishes original articles in the field of Bengal Studies, as broadly defined. The views expressed are of the authors, not necessarily those of the Foundation or its officials. The editor is the communication channel and receives and finalizes the Articles. Books and audio recordings for review and citations for current publications should also be sent to the appropriate editor or bibliographer.

The vision of *Bhābanagara* is to create a long-term coordination between research initiatives in the field of Bengal Studies in the international arena. Scholars from many countries in Europe, America, Australia, Africa and Asia have for decades worked on Bengal Studies focusing on the rich and widely popular intangible cultural heritage of Bangladesh, West Bengal of India and Bangla language. But now a need is felt to incorporate these disconnected ventures into a mainstream confluence of international Bengal Studies.

This publication will articulate the achievements, characteristics and historical chronology of Bengal Studies, which will hopefully be stimulating the researchers of the subsequent generations and provide them with effective directions for future research. This process will also re-invigorate interpersonal relations among the faculties in the universities across Europe, North and South America, and Asia where Bangla, Sanskrit, Arabic, Persian, Urdu and Hindi languages and literatures–both oral and written–are the research disciplines as a subset of Asian languages and literature. The potential for greater inter-connectedness greatly encourages us as we shape *Bhābanagara* into an effective international tool of Bengal Studies.

Vabnagar Foundation

Vabnagar Foundation is a cultural organization, registered with the government of Bangladesh, dedicating to promote research in Bangla literature, language and culture both locally and globally. The Vabnagar Foundation was accredited as a UNESCO-accredited NGO in 2024. The Foundation in August 2015, September 2014 and December 2013 organized symposiums on ethnomusicology and performance studies at EMK Center, American Embassy, Dhaka, with wide participation of the scholars from Bangladesh, India, Japan and the United States. Some of the key initiatives were: 1. Workshop on the Implementation of the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and field work across villages in the district of Manikganj on 19 July 2013; 2. Musical dance performance of "Bishad-Jaari", based on classic Bengali novel *Bishad-Sindhu* at the Hay Festival of Literature & the Arts Ltd in Dhaka on 14 November 2013; 3. Arrange a special exhibition with the associate organization VIAAN on the theme of " The dream's Wear: Influenced by folk painting and song" at La Galerie, Alliance Française, Dhaka, on May 2013; 4. Sadhu Paribarer Gaan (The Songs of Sadhu Family) songs of devotees arranged with two Sadhu families using traditional musical instruments without electronic sound systems. Sadhu family's singers presented original Baul songs in traditional manner in the event on 30 September 2011.

Vabnagar has been ceaselessly working for revival of the ancient Bengali Buddhist Mystic Songs of Charyapada, in easy contemporary Bangla language using traditional tunes supported by indigenous musical instruments that the Baul-Sufi practitioners of marginalized economic backgrounds are performing. In this project, there is equal participation of women Bauls-Sufi Sadhakas. Vabnagar Foundation organizes cultural tourism often, as an example, in 2015, Vabnagar organized Charyasongs at the ancient Buddhist heritage known as Sompur Mahavihara (Paharpur Buddhist Vihara), for the teachers and students of the Hiroshima University.

From 2014, Every week on Wednesday the young group of Bhābanagara, called Sadhusongo organize a performance and discussion circle for practicing and safeguarding of the intangible the cultural heritage (ICH) and revival of the Charya Songs, the ancient testimony of Bangla language, literature and culture. The young group of the sadhusongo every month travel rural areas and arrange workshop on ICH. In 2024, the Vabnagar Foundation, in collaboration with the Bangladesh Shilpakala Academy, organized the Charyapada Revival Festival 2024 to mark the 500th session of Bhābanagara Sadhusongo—a weekly gathering dedicated to the revival of Charyapada songs by the Bhabasadhaks.

ভাবনগর

B H Ā B A N A G A R A

Peer-reviewed
International Journal of Bengal Studies
VOLUME 19 • NUMBER 23 • JUNE 2025

ISSN 2313-6065

সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী	Editorial Advisory Board
অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন	Professor Syed Akram Hossain
অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ	Professor Hayat Mamud
অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	Professor Syed Manzoorul Islam
অধ্যাপক রফিক আজম	Professor Rafiq Azam
লেখক-অনুবাদক মাসরুর আরেফিন	Writer-Translator Mashrur Arefin
সহযোগী সম্পাদক নূরুননবী শান্ত	Associate Editor Nurunnabi Shanto
সহকারী সম্পাদক জোবায়ের আবদুল্লাহ	Assistant Editor Zobayer Abdullah
প্রচ্ছদ লিপি কাইয়ুম চৌধুরী	Cover Lettering Qayyum Chowdhury
প্রচ্ছদ চিত্র সুশান্ত কুমার অধিকারী	Cover Illustration Sushanta Kumar Adhikary
সম্পাদক সাইমন জাকারিয়া	Editor Saymon Zakaria

Vabnagar Foundation
House No.: 86, Road No.: 7, Block-C, Mansurabad R/A
Mohammadpur, Dhaka 1207, Bangladesh.
Phone : +8801551814078, E-mail : vabnagarfoundation@gmail.com
www.bhabanagarafoundation.org/journal/bhabanagara

প্রচ্ছদ পরিচিতি

প্রচ্ছদের ছবিটির ভাব-উপাদান গড়ে উঠেছে মূলত লোকায়ত বিশ্বাস ও ভাবনার মনোজাগতিক মিথস্ক্রিয়ায়। ভক্তি-ভাবের এক বাঙালি নারী এই ছবির কেন্দ্রবিন্দু। তিনি শৈশব থেকে 'বেহুলা লখিন্দর', লালন ফকিরের 'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি...', বিজয় সরকারের 'পোষা পাখি উড়ে যাবে...' প্রভৃতির ভাব-তত্ত্ব শ্রবণ করে এসেছেন, একটা বয়সে এসে ওই তত্ত্বের অর্থ খুঁজতে অথবা প্রশ্নমালার উত্তর খুঁজতে মনপাখিকে সম্মুখে বসিয়ে কথোপকথন করছেন। মনসাদেবী একটি বিষধর সাপ রূপে এ দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রিয়জন মন ছেড়ে যায় অথবা আত্মা দেহ ছেড়ে যায়, পুনরায় দেহে ও মনে ফেরে। এই নিত্য যাওয়া-আসার সংসারে কী পাই আর কী না পাই, কী আসে যায়? নারীটি হয়তো 'কী পাইনি তারি হিসাবে মিলাতে মন মোর নাহে রাজি...' রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সুর মেলাবেন।

চিত্র নির্মাণে নানা কৌশলের মধ্যে বিশেষ একটি প্রাচীন মাধ্যম ছাপচিত্র প্রয়োগ করা হয়েছে। উনিশ শতকে বিভিন্ন মুদ্রিত পুঁথিতে এ ধরনের কাঠ খোদাইকৃত চিত্র ব্যবহৃত হতো। মূলত বাঙালির লোকায়ত বিশ্বাস ও পুরাণ নির্ভর পুথিকাব্যে মুদ্রিত এ ধরনের শিল্পধারা ভারত উপমহাদেশের একটি বিশেষ শৈলী হিসেবে শিল্পকলার ইতিহাসে স্থান করে নেয়। এই ধারার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারী সমকালের শিল্পাদর্শে এই চিত্রশিল্পটি নির্মাণ করেছেন। নির্মাণকাল: ২০২৩।

International Correspondents

Bishawjit Saha, Muktadhara, 37-59 74th Street # 2, Jackson Heights, NY, 11372, USA
Naveeda Khan, Anthorpology Department, Johans Hopkins University, Baltmore, USA
Iqbal Karim Hasnu, 248 Fairglen Avenue, Scarborough, Ontario, MIW 1B1, CANADA
Durdana Ghias, 6/124 Saywell Road, Macquarie Fields, New South Wales 2564, AUSTRALIA
Priyanka Basu, B452 Paul Robeson House, 1 Penton Rise, London WC1X 9EH, UK
Zhang Xing, Department of South Studies, Peking University, Beijing 100871, CHINA
Jindra Štolcová, Rymarovska 434, Praha 19-Letnany, 19900, CZECH REPUBLIC

Printing & Publication Informations

Printed by Laser Scan Limited, 8/3, (2nd floor) Topkhana Road, Segunbagicha Dhaka-1000, Bangladesh. E-mail : laserscanbd@yahoo.com

Published by Ektara, a sister concern of Bhabanagara Foundation, House No: 86, Road No: 7, Block-C, Mansurabad R/A, Mohammadpur, Dhaka- 1207, Bangladesh, Phone : +01830203322, Whats Apps : +8801551814078
E-mail : dr.zakariasaymon@gmail.com, bhabanagara.journal@gmail.com
Website: www.babanagarafoundation.org

Open Access Link : www.bhabanagarafoundation.org/journal/bhabanagara

Price : 150.00 (BDT), 15.00 (USD)

সূচি/Contents

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি/Instraction for sending Writings

সম্পাদকীয়/From the Editor

প্রবন্ধ/articles

ধর্মমঙ্গল ও মানবাধিকার — রেবেকা মানরিং — ২৩১৫
doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.1

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহৎ চরিত্র — দং ইউছেন — ২৩৩১
doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.2

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক উপন্যাস :
রুশ ভাষায় অনুবাদ-অভিজ্ঞতা ও অনুবাদ-পদ্ধতি — ইভা লেকারেভা — ২৩৫৭
doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.3

হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে চরিত্র সৃষ্টির কৌশল :
প্রেমে পড়া যুবকের দুটি দৃষ্টান্ত — লু মেংকি — ২৩৬৭
doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.4

অনুবাদ/Translation

ইংরেজি থেকে বাংলা

সংগীতনৃবিদ্যা : একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়
অধ্যায় নবম : সংগীতনৃতাত্ত্বিকদের কর্মপরিধি
তিমথি রাইস — অনুবাদ: নূরুননবী শান্ত — ২৩৭৯
doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.5

বাংলা থেকে ইংরেজি

চিলেকোঠার সেপাই : ত্রয়োদশ অধ্যায়
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস — অনুবাদ : ম্যাথিউ ডি. রিচ — ২৩৯১
doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.6

সাক্ষাৎকার/Interview

পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমার আগ্রহ বাড়ছে
কিথ ই. কান্ত — সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সাইমন জাকারিয়া — ২৪০১
doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.7

শ্রদ্ধাঞ্জলি/Tribute

প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অনন্য এক পণ্ডিত টনি কে. স্টুয়ার্ট — ২৪২৩
doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.8

Notes On Contributors — ২৪২৭

ভাবনগর

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বেঙ্গল স্টাডিজ

প্রবন্ধ/অনুবাদ পাঠানোর নিয়মাবলি

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গবেষণারত অবাঙালি গবেষক ও অধ্যাপকদের বাংলায় রচিত প্রবন্ধ/গবেষণাপত্র/অভিসন্দর্ভ প্রকাশের লক্ষ্যে *ভাবনগর: ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বেঙ্গল স্টাডিজ* প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে ফরাসি, ইংরেজি, জাপানিজ, চাইনিজ, ইটালিয়ান, জার্মানি প্রভৃতি ভাষার গবেষক-অধ্যাপকদের বাংলায় রচিত মৌলিক প্রবন্ধকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। পাশাপাশি অবাঙালিদের করা বাংলা সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ ও অবাঙালিদের প্রবর্তিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণাপদ্ধতি, নীতিমালা, দর্শন, সাহিত্যতত্ত্ব প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ এবং অবাঙালিদের রচিত ও সম্পাদিত বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা প্রকাশিত হয়।

ভাবনগর: ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বেঙ্গল স্টাডিজ প্রধানত অবাঙালি গবেষক ও অধ্যাপকদের কাছে বাংলায় রচিত মৌলিক প্রবন্ধ পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাই।
বাংলায় রচিত প্রবন্ধ প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

১. প্রবন্ধের বাংলা ও ইংরেজি শিরোনাম প্রদান করতে হবে।
২. লেখকের নাম বাংলা ও ইংরেজিতে প্রদান করতে হবে।
৩. প্রবন্ধে শুরুতে ইংরেজি ভাষায় ১৫০ থেকে ৩০০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) প্রদান করতে হবে।
৪. প্রবন্ধের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলির আলোকচিত্র, গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র, মূল গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত উপাদানের ছবি, লেখকের ছবি প্রভৃতি প্রদান করতে হবে।
৫. প্রবন্ধের শেষে প্রয়োজন অনুসারে টীকা, তথ্যনির্দেশ ও গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করতে হবে।

ভিন্ন ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ এবং বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

১. অনূদিত মূল উপাদানের শিরোনাম ও অধ্যায় সংখ্যাসহ অধ্যায়ের নাম, লেখকের নাম, অনুবাদকের নাম বাংলা ও ইংরেজিতে প্রদান করতে হবে।
২. অনূদিত উপাদানের শুরুতে ইংরেজি ভাষায় ১৫০ থেকে ৩০০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) প্রদান করতে হবে।
৩. অনূদিত গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র, প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলিসহ মূল লেখক ও অনুবাদকের ছবি প্রভৃতি প্রদান করতে হবে।
৪. অনূদিত উপাদানের শেষে প্রয়োজন অনুসারে টীকা, তথ্যনির্দেশ ও গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করতে হবে।

অবাঙালিদের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের আলোচনা প্রেরণের ক্ষেত্রে আলোচনার শিরোনাম, লেখকের নাম বাংলা ও ইংরেজিতে প্রদান করতে হবে। সেই সঙ্গে আলোচনার শুরুতে ইংরেজি ভাষায় ১৫০ থেকে ৩০০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) প্রদান করতে হবে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদ, লেখক ও আলোচকের ছবি প্রদান করতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা: ড. সাইমন জাকারিয়া, সম্পাদক, *ভাবনগর : ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বেঙ্গল স্টাডিজ*, বাসা-৮৬, রোড-৭, ব্লক-সি, মনসুরাবাদ আ/এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭, ফোন: ০১৫৫১৮১৪০৭৮, ইমেইল : bhabanagara.journal@gmail.com

সম্পাদকীয়/From the Editor

প্রাচীন, মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের নানা পর্বে বাংলার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, সাধনা, ঐতিহ্য নানা মাত্রায় বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলার বাইরে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বহুদিন ধরে একাডেমিক গবেষণা, অনুবাদের বহুমাত্রিক তৎপরতা বিদ্যমান রয়েছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যায়নের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ বা শাখায় নিয়মিতভাবে উচ্চতর পর্যায়ে পঠন, পাঠান, গবেষণা, অনুবাদ চর্চার প্রাণবন্ত ঐতিহ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সে সকল গবেষণা কার্যক্রম অনিবার্যভাবে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইটানিয়ান, জাপানিজ, চাইনিজ প্রভৃতি ভাষায় সম্পন্ন হয়। ফলে, বাংলাদেশ, ভারত বা অপরাপর দেশে বসবাসরত বাংলাভাষীদের পক্ষে অবাঙালিদের রচিত বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি নির্ভর গবেষণার সন্ধান অজ্ঞাত থেকে যায়। অন্যদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যারা বাংলা ভাষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন তাদের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টিকারী কোনো একক একাডেমিক প্লাটফর্ম না-থাকায় অনেক সময় নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও গবেষণাকর্ম একত্র করে দেখার অবসর পান না। মূলত এই দুটি দিক বিবেচনায় নিয়ে *ভাবনগর : ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বেঙ্গল স্টাডিজ* প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রথম থেকে *ভাবনগর* জার্নালে অবাঙালিদের বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সংগীত, নাট্য, নৃত্য, ঐতিহ্য, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক গবেষণা কর্মকাণ্ডের সাম্প্রতিক তৎপরতার প্রবণতাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এবারে *ভাবনগর* জার্নালের ১৯তম খণ্ড হিসেবে ২৩তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। বর্তমান সংখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ চারটি প্রবন্ধ, দুটি অনুবাদ, একটি সাক্ষাৎকার এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংকলিত প্রতিটি রচনা, অনুবাদ, পুস্তক আলোচনা প্রভৃতি *ভাবনগর* জার্নালের জন্য মৌলিকভাবে সম্পাদিত। এরপূর্বে এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত কোনো লেখা কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

এই সংখ্যার সূচনায় আমেরিকার ব্লুমিংটনের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রেবেকা মানরিং রচিত "*ধর্মমঙ্গল* ও মানবাধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এতে গবেষক বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের ধারায় রচিত রূপরাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গল* কাব্যকে আধুনিক মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

ভাবনগর জার্নালের এই সংখ্যার দ্বিতীয় প্রবন্ধ রচনা করেছেন চীনের কিংবদন্তি অধ্যাপক, অনুবাদক ও চীনা ভাষায় রবীন্দ্ররচনাবলীর সম্পাদক দং ইউছেন। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহৎ চরিত্র"। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক ও ব্যক্তিক পরিচয়ের নানা দিক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক পরিচয়ের আশ্রয়ে তাঁর মানবিক মাহাত্ম্য তুলে ধরা হয়েছে।

এ সংখ্যার তৃতীয় প্রবন্ধের লেখক রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক ইভা লেকারেভা, তিনি সম্প্রতি বিভূতিভূষণের বিখ্যাত উপন্যাস *আরণ্যক* রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সেই আলোকে তাঁর রচিত "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* উপন্যাস : রুশ ভাষায় অনুবাদ-অভিজ্ঞতা ও অনুবাদ-পদ্ধতি" শীর্ষক প্রবন্ধ এখানে সংকলিত হলো।

ভাবনগর জার্নালের এ সংখ্যার চতুর্থ লেখক জাপানের গুয়াঞ্জু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও অধ্যাপক লু মেংকি (শান্তি) । "হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে চরিত্র সৃষ্টির কৌশল : প্রেমে পড়া যুবকের দুটি দৃষ্টান্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের ছোটগল্পে চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্য এবং চরিত্রের ভেতর প্রতিফলিত প্রেমিক মানুষের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

ভাবনগর জার্নাল সূচনা থেকে ইংরেজি থেকে বাংলায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাদৃত বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিগত বিদ্যার তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ প্রকাশ করে আসছে। পূর্ববর্তী সংখ্যার সূত্র ধরে এবার প্রকাশিত হলো তিমথি রাইসের বিখ্যাত গ্রন্থ *এথনোমিউজিকোলজি: এ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন*-এর নবম অধ্যায়ের অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক ও ফোকলোরতাত্ত্বিক নূরুননবী শান্ত। এবারে মুদ্রিত অনুবাদে "সংগীতনৃতাত্ত্বিকদের কর্মপরিধি" সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ভাবনগর-এর অনুবাদ পর্বে বাংলা থেকে ইংরেজিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিখ্যাত উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাই*-এর অনুবাদ। অনুবাদক আমেরিকার দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর পিএইচডি স্কলার ম্যাথিউ ডি. রিচ। এ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো উপন্যাসটির ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সাক্ষাৎকার পর্বে আমেরিকার গবেষক কিথ ই. কান্তর সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিথ মূলত দক্ষিণ এশিয়ার ধর্ম ও যোগ-সাধনার বিশেষজ্ঞ। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত যোগ-সাধনার সাথে বাউল-সুফি সাধনার নিবিড় পর্যবেক্ষক। তাঁর সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ, ভারত ও পাশ্চাত্য দেশের সাধনার তুলনামূলক আলোচনার পাশাপাশি লোকায়ত গবেষণার নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে ইঙ্গিত লভ্য।

ভাবনগর জার্নালের এ সংখ্যায় আমেরিকার কিংবদন্তি গবেষক অধ্যাপক টনি কে. স্টুয়ার্টের প্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়েছে। তিনি ছিলেন প্রাক-আধুনিক ধর্ম, সাধনা, দর্শন কেন্দ্রিক লোকায়ত বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ গবেষক, বিশ্লেষক ও অনুবাদক। তিনি সমগ্র জীবন বাংলাদেশের লোকায়ত গবেষণার প্রতি নিজে যেমন আকৃষ্ট ছিলেন তেমনি অন্যদের উদ্বুদ্ধ করতেন বাংলাদেশে এসে বাংলা শিক্ষণে এবং বাংলাদেশের লোকায়ত সাহিত্য নির্ভর গবেষণা করতে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ এক অকৃত্রিম বন্ধুকে হারিয়েছে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা।

যথাসময়ে *ভাবনগর : ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বেঙ্গল স্টাডিজ*-এর বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। ভবিষ্যতে আমরা *ভাবনগর* প্রকাশনার ধারাবাহিকতা রক্ষায় চেষ্টা করবো।

বঙ্গবিদ্যার প্রসার হোক। সকলের মঙ্গল হোক।

খণ্ড ১৯, সংখ্যা ২৩
Vol. 19, No. 23

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

জুন ২০২৫
June 2025

doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.1

ধর্মমঙ্গল ও মানবাধিকার

রেবেকা মানরিং

এতে শনিবার ভাব ঠিক দুপুর বেলা, সম্মুখে দাওাইল ধর্ম গলে চন্দ্রমালা।
গলায় চাঁপার মালা আশাবাড়ি হাতে, ব্রাহ্মণের রূপে ধর্ম দাওাইল পথে।

রূপরামের ধর্মমঙ্গলের আখ্যাপত্রে নন্দলাল বসুর অংকিতচিত্র

*DharmaMaṅgal*a and Human Rights

Rebecca J. Manring

Abstract

This essay explores how *DharmaMaṅgala*, a seventeenth-century Bengali epic by Rūparām Cakravartī, intersects with contemporary human rights discourse. Centered on the deity Dharma Ṭhākur and his earthly representative Lau Sen, the narrative reflects enduring concerns with justice, dignity, and social inclusion. Though framed as a devotional text, the poem gives voice to marginalized figures—women, lower-caste individuals, and the poor—highlighting their agency and moral strength within a deeply hierarchical society.

Rebecca J. Manring examines how characters like Lau Sen's loyal companion Kalu Dom, a pig-herder from a stigmatized caste, and brave women such as Rañjabatī and Lakṣyā, challenge traditional power structures through acts of courage, sacrifice, and compassion. The epic's setting in rural Bengal and use of vernacular language ground it in the everyday lives of ordinary people, offering a counterpoint to elite literary and religious narratives.

Engaging Martha Nussbaum's "capabilities approach," which defines human rights in terms of enabling individuals to live fully and freely, Manring argues that *DharmaMaṅgala* anticipates a vision of human dignity rooted in empathy, cooperation, and ethical responsibility. While the poem does not overturn caste or class hierarchies, it presents a complex moral universe in which communal well-being and mutual respect take precedence over dominance.

Ultimately, this essay positions *DharmaMaṅgala* as both a literary and ethical resource—an example of how traditional narratives can inspire reflection on justice, shared humanity, and the moral obligations of privilege. In doing so, it reaffirms literature's role in shaping and sustaining human rights consciousness.

বড়ু চণ্ডীদাস বলেছেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

১৯৪৮-এর মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে বলা আছে, "সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিৎ।"

এই ঘোষণাপত্র দেখে আমাদের মনে হতে পারে যে এটা খুবই সাধারণ এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন।

কিন্তু আমরা আজকের জগতে কী রকমের ব্যবহার দেখি? ধনীদের বাড়ির সামনে অত্যধিক দারিদ্র্য। শুধু বাংলায় নয়, ইউনাইটেড স্টেট অব আমেরিকাতেও, এমনকি অন্য দেশেও।

দারিদ্র্য একমাত্র সমস্যা নয়; অনেক মানুষের খাবার নেই, বাড়ি নেই, পরিষ্কার জল নেই; তারা শিক্ষালাভ করার সুযোগ পাচ্ছে না; অসুস্থ হয়ে পড়ছে, স্বাস্থ্যব্যবস্থার সুযোগ পাচ্ছে না।

নারীদের অবস্থা আরও কঠিন। ওরা কী করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারবে? পারবে না।

তো কী করবো? আমরা যাদের বাড়ি, খাবার, চাকরি আছে, তারা হতভাগ্য মানুষদের জন্য কী করবো? উপায় কোথায় পাবো?

এই সব সমস্যা কি নতুন? না; মানবজাতির ইতিহাসে আমরা এই সব সমস্যা দেখে এসেছি, অনেক মানুষ পীড়িত হয়েছে, অনেক মানুষ পীড়িত হবে। খ্রিষ্টানদের পবিত্র বাইবেলে যিশু খ্রীষ্ট বলেছেন, গরিব মানুষ সব সময়ে আপনাদের কাছে থাকবে। ওদের অবস্থা আমাদের হাতে, আর অবস্থার উপশম ও আমাদের হাতে। কারণটা এই যে, আসলে কোন "আমরা–ওরা" নেই। আমাদের মধ্যে কী পার্থক্য আছে? একজন ভাগ্যবান, অন্যজন হতভাগ্য। কিন্তু আমরা সবাই মানুষ।

সাহিত্য পড়ে আমরা অন্যদের জীবনের ব্যাপারে শিখতে পারি। অন্য সংস্কৃতিতে পরিবারের গঠন কেমন, লোকে কী কী চাকরি করে, কী রকমের খাবার খায়, কী রকম কাপড় পরে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যাদের জীবনধারা আমাদের জীবনের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সাহিত্য পড়ে আমরা তাদের জীবনের প্রতি আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠি।

মহাকাব্য পড়ে আমরা লেখকের সংস্কৃতির নৈতিক ধারণা সম্পর্কে জানতে পারি।

মহাভারত আমার খুব ভাল লাগে; মহাভারত পড়াতে ভাল লাগে। এই মহাকাব্য পড়ে মার্কিন ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতীয়দের নিজস্ব ভাবমূর্তি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে।

তাহলে, ওখানে, মহাভারতে মানবাধিকারের আঙ্গিক থেকে আমরা কী পাব?

মহাভারতে, দ্রোণাচার্য গরিব ছিলেন। ওঁনার ছেলে কখনও দুধ খায় নি। ওঁর বন্ধু কোন সাহায্য করে নি।

একলব্য ধনুর্বিদ্যার শিক্ষা নিতে চেয়েছে, বড় যোদ্ধা হতে চেয়েছে। কিন্তু জাতের জন্য, তার অস্ত্রশিক্ষার অধিকার ছিল না।

এবার আসি নারীদের কথায়। দুহাজার বছর আগেও নারীদের মর্যাদা নিয়ে মহাকবি অনেক কঠোর কথা বলেছেন।

আরও পরে বিংশ শতাব্দীত রবীন্দ্রনাথের "গান্ধারীর আবেদন" কবিতায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পরে, গান্ধারী বলেন:

> "তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ, বিধাতার বাম হস্ত; ধর্মরক্ষা-কাজ
> তোমা–'পরে সমর্পিত। শুধাই তোমারে,
> যদি কোনো প্রজা তব সতী অবলারে
> পরগৃহ হতে টানি করে অপমান
> বিনা দোষে – কী তাহার করিবে বিধান?"
> ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দেন, "নির্বাসন"।
> আবার গান্ধারী বলেন, "তবে আজ রাজপদতলে
> সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে
> বিচার প্রার্থনা করি। পুত্র দুর্যোধন
> অপরাধী প্রভু। তুমি আছ, হে রাজন,
> প্রমাণ আপনি। পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
> স্বার্থ লয়ে বাধে অহরহ – ভালমন্দ
> নাহি বুঝি তার; দণ্ডনীতি, ভেদনীতি,
> কুটনীতি কত শত, পুরুষের রীতি
> পুরুষেই জানে। বলের বিরোধে বল,
> ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
> কৌশলে কৌশলে হানে; মোরা থাকি দূরে
> আপনার গৃহকর্মে শান্ত অন্তঃপুরে।

এই অবস্থায় গুরুরা কোন কথা বলেন নি; শুধু একজন নারী, অন্য নারীর অবস্থা নিয়ে কথা বলে। অন্যদের কোন সাহস নেই। এই অবস্থায়, লজ্জাটা কার?

সব চেয়ে বড় সমস্যা এই যে আমরা যখন প্রথমে কাউকে দেখি, আমরা দেখি আমাদের মধ্যে কী কী বিসদৃশ। আর এই রকমের পার্থক্য প্রায় আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কেন? কোন কারণ নেই। আমরা কী করে এই পার্থক্যের জায়গায় সাদৃশ্য দেখতে শিখতে পারি?

আমি মার্কিন, আপনারা বাঙালি, বাংলাদেশি; অন্য কেউ তামিল কাশ্মিরি, চাকমা, অথবা জাপানি। কেউ নারী, কেউ পুরুষ; কেউ ধনী, কেউ গরীব। কিন্তু আমাদের সবার খাবার লাগে, সবাই চাই যে আমাদের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে পড়ুক। তো আমরা কী করে একে অপরের সুবিধার জন্য, উপকারের জন্য, একসঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করব?

সাহিত্যে উপদেশ পাওয়া যায়। একটু আগে আমি রবীন্দ্রনাথের কথা, মহাভারাতের কথা বলেছি; বাঙালি মধ্যযুগের সাহিত্যেও এই বিষয়ে কথা আছে।

আমি এখন মঙ্গল-কাব্য নিয়ে গবেষণা করি। পনেরো-কুড়ি বছর আগে, সুকুমার সেনের পুঁথির সংগ্রহে ওঁর পুত্র অধ্যাপক সুভদ্র কুমার সেন রূপরাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের একটি অখণ্ডিত পুঁথি খুঁজে পেয়েছেন।

ধর্মমঙ্গলের অনুবাদ করতেকরতে, আমরা সেই সময়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে অনেক কথা শিখেছি।

মঙ্গলকাব্য সাধারণত দীর্ঘ কবিতা, প্রতিটিই নির্দিষ্ট কোনো দেবতাকে নিবেদিত এবং প্রায়শই সেই দেবতার উৎসব উপলক্ষে তার পাঠ শুনতে পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্যের অনেক মিল থাকলেও, এগুলো মূলত তাদের নিজ নিজ স্থানীয় পরিবেশেই সৃষ্টি। প্রতিটি কাব্যে দেখানো হয় কিভাবে সেই দেবতা, সাধারণত অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে, মর্ত্যে মানুষের মধ্যে নিজের পূজার প্রবর্তন ঘটান। এই দেবতারা প্রায়শই বাঙালির রূপে উপস্থাপিত, যদিও কখনো কখনো পুরাণের দেবতাদের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, আর বাকি প্রধান চরিত্রগুলো সাধারণ বাঙালিরাই—ব্যবসায়ী, জেলে, গৃহবধূ ইত্যাদি।

অনেক কবিই এই ঘরানায় কাব্য রচনা করেছেন, প্রত্যেকে এতে নিজস্ব রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য যোগ করেছেন। আমাদের কাছে চণ্ডী, মনসা ও শীতলা দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত একাধিক মঙ্গলকাব্য আছে। উদাহরণস্বরূপ, সাপের দেবী মনসা—যারা তাকে পূজা করতে অস্বীকার করে, তাদের সাপে কেটে মেরে ফেলে; আর যারা পূজা করে, তাদের তিনি বিপুল আশীর্বাদ দেন। তবে মঙ্গলকাব্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে খুব কম পুরুষ দেবতাকেই দেখা যায়– তাদের মধ্যে আছে দক্ষিণ রায় ও ধর্মঠাকুর।

কিছু মঙ্গল কাব্য বেশ দীর্ঘ; যেমন, রূপরামের *ধর্মমঙ্গল*-এ প্রায় ২৬,০০০ পদ রয়েছে। আবার কিছু মঙ্গল কাব্য বেশ সংক্ষিপ্ত। এই কাব্যগুলোর ভাষা মধ্যযুগের বাংলা, যখন বাংলা ভাষা ব্যাকরণগত রূপান্তর প্রক্রিয়া চলমান, ফলে যারা এই ধারার সাথে অপরিচিত, তাদের জন্য পাঠ করা বেশ চ্যালেঞ্জের। এটি রাজদরবারের ভাষা নয়, বরং মাঠ-ঘাট-গ্রামের, চাষাভুষো মানুষের ভাষা ও চিত্রকল্পে পূর্ণ। এটি বৈষ্ণব জীবনী বা পদাবলীর তুলনায় অনেক বেশি মাটির গন্ধযুক্ত, বাস্তব ব্যবহারিক ভাষায় লেখা। মঙ্গল-কাব্য গাওয়ার জন্য রচিত, এবং বাংলা পয়ার ছন্দ[১] গানের জন্য উপযুক্ত ছন্দবদ্ধতা এনে দেয়। এই কাব্যগুলি ধর্মীয় রীতি মানতে বাধ্য নয়, তাই গায়কদের/পরিবেশকদের পরিবেশনায় অনেক স্বাধীনতা থাকে।

বর্তমানে যে *ধর্মমঙ্গল* কাব্যগুলি পূর্ণাঙ্গভাবে টিকে আছে, তার মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তী রচিত *ধর্মমঙ্গলই* প্রাচীনতম; এটি রচিত হয় ১৬৬২/৬৩ সালে। আমাদের কাছে ১৭৬৯ সালের পর রচিত কোনো *ধর্মমঙ্গল* নেই—এই বছরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই অঞ্চলের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।[২] ব্রিটিশ শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এবং জমিদাররা ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে আসার পর, স্থানীয় সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি চর্চায় আর সমর্থনদানের প্রয়োজন ছিল না।

ধর্ম ঠাকুর একজন অনন্য পশ্চিম বঙ্গীয় দেবতা। মূলত রাঢ় অঞ্চলে, বিশেষ করে বীরভূম ও বর্ধমান জেলার আশেপাশে, তিনি পূজিত হন। গ্রামের মানুষ—কৃষক ও অন্যান্য সাধারণ, ব্রাহ্মণ নন এমন লোকেরা—বসন্তকালে ধর্ম ঠাকুরের পূজা করে, যখন প্রচণ্ড গরমে গ্রামের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা পুকুরগুলো প্রায় শুকিয়ে যায়। তারা বৃষ্টি কামনা করে, যা জমিকে আবার উর্বর করে তুলবে। তবে ধর্ম ঠাকুর সন্তানহীন নারীদের এবং কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত মানুষদেরও আশ্রয়। সাধারণত তাঁর পূজা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দ্বারা নয়, বরং সাধারণ গৃহস্থদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। তবে তার আগে তাদের কঠোর ব্রত ও সাধনায় নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়, যার মধ্যে গাজন[৩] নামক আচার চলাকালীন সংসার ত্যাগও অন্তর্ভুক্ত। ভক্তরা এই আচারসমূহ ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং গোটা সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যই সম্পাদন করে।

রূপরাম ব্যাখ্যা করেন কীভাবে ধর্ম ঠাকুরের পূজা শুরু হয়েছিল। তাঁর *ধর্মমঙ্গল*-কে মহাকাব্য বলা অত্যুক্তি নয়, কারণ এটি মহাভারত ও অন্যান্য মহাকাব্যের মতোই দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ধারণ করে। যদিও এই কাব্যের বাহ্যিক নায়ক রাজপুত্র লাউসেন, তবুও এই কাহিনির অন্যান্য চরিত্রগুলো অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

গল্পটি হলো: আঞ্চলিক রাজা, যিনি গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত, একাধিক অধীনস্থ রাজ্য শাসন করেন যেগুলো নির্দিষ্ট সময় অন্তর গৌড়েশ্বরকে কর প্রদান করতে বাধ্য। তাঁর প্রধানমন্ত্রী মহামদ[৪], যিনি তাঁর শ্যালকও, সেই প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। একটি অধীনস্থ রাজ্যের শাসক সোম ঘোষ কর পরিশোধের জন্য জাল মুদ্রা ব্যবহার করেন। এর ফলে মহামদ তাঁকে শিকলে বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। গৌড়েশ্বর এ দৃশ্য দেখে রুষ্ট হন, এই নিষ্ঠুর শাস্তির জন্য। তিনি শুধু সোম ঘোষকে মুক্তই করেন না, বরং তাঁকে নিজের একটি রাজ্য এবং বহু উপহার দান করেন। সোম ঘোষ, যিনি একজন গয়াল (গোয়ালা) জাতির এবং দেবীর একনিষ্ঠ ভক্ত, তখন আরেক অধীনস্থ রাজা কর্ণসেনের তুলনায় উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবী সোম ঘোষকে একটি পুত্রসন্তান দান করেন—ইচাই ঘোষ। ইচাই দেবীর প্রতি গভীর ভক্তির মাধ্যমে অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। সে কর প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং কর্ণসেনের ভূখণ্ড দখল করে নেয়। এর ফলে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়, যাতে কর্ণসেনের ছয় পুত্রই নিহত হয়। তাদের স্ত্রীরা সতী করেছেন, মা শোকে মারা যান এবং কর্ণসেন গভীর হতাশায় ডুবে যায়। গৌড়েশ্বর তাঁর এই অধীনস্থ রাজা কর্ণসেনের দুর্দশায় সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন এবং চিন্তা করেন কীভাবে তাকে পুনরায় জীবনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা যায়। তিনি ঠিক করেন, নিজের স্ত্রীর ছোট বোন রঞ্জাবতীকে কর্ণসেনের সঙ্গে বিবাহ দেবেন। কিন্তু তিনি জানতেন, তাঁর শ্যালক মহামদ—যিনি রঞ্জাবতীর ভাই—বয়সের ব্যবধানের কারণে এই বিবাহে প্রবল আপত্তি জানাবে। তাই গৌড়েশ্বর মহামদকে একটি ব্যবসায়িক কাজে দূরে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতেই বিবাহ সম্পন্ন করেন।

মহামদ ফিরে এসে এই বিবাহের কথা জানতে পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি শপথ করেন, যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন "বুড়ো লোকটির" মুখ দেখবেন না। তিনি নিজের বোনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং তাঁকে নিঃসন্তান হওয়ার অভিশাপ দেন।

রঞ্জাবতী এসব কিছুই জানতেন না। তিনি অবাক হন, কেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই মহামদ তাঁর বিয়েতে পর্যন্ত উপস্থিত হননি। পরিবারের কেউ কখনও দেখা করতে না আসায় তিনি মর্মাহত হন। তিনি স্বামী কর্ণসেনকে অনুরোধ করেন তাঁকে গৌড়ে—পিতৃগৃহে—একবার নিয়ে যেতে। অনেক অনুরোধের পর কর্ণসেন রাজি হন। কিন্তু কর্ণসেন যখন রাজসভায় উপস্থিত হন, মহামদ তাঁকে নিঃসন্তান বলে অপমান করেন, আর গৌড়েশ্বর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন—কোনও প্রতিবাদ করেন না। এই ঘটনার পর রঞ্জাবতী তাঁর ভাইকে ত্যাগ করেন এবং নিজের 'বন্ধ্যাত্ব'-বদনাম খণ্ডন করতেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করে তোলেন।

একদিন ধর্ম ঠাকুরের একজন পুরোহিত, রামাই পণ্ডিত, বার্ষিক গাজন উৎসব উপলক্ষে শহরে আসেন। রঞ্জাবতী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—ধর্ম ঠাকুর কি তাঁর এই সংকটময় অবস্থায় কিছু সহায়তা করতে পারেন? তিনি এক ধর্মমন্দির নির্মাণ করান এবং দেবতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপাসনা ও আচার শুরু করেন, কিন্তু কোনও ফল দেখতে পান না। অবশেষে তিনি রামাই পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করেন—তিনি আর কী করতে পারেন। রামাই জানান, একমাত্র উপায় *শালে ভর ব্রত*, একটি আচার, পালন

বুকেতে বাজিল শাল পৃষ্ঠে হৈল পার, খানি খানি হৈল রানী রক্ষা নাহি আর্ব্ব।

সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত রূপরামের ধর্মমঙ্গলে মুদ্রিত চিত্র, চিত্রশিল্পী : নন্দলাল বসু

করা, যেখানে নিজেকে লোহার কাঁটার উপর নিবেদন করতে হয়। (আধুনিক পাঠকের কাছে এটি অবাক লাগতে পারে—কীভাবে এমন আত্মোৎসর্গ বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতে পারে? কিন্তু *ধর্মমঙ্গল* কাব্য বীরোচিত আত্মত্যাগ ও নাটকীয় কর্মের দৃষ্টান্তে ভরপুর।) রঞ্জাবতী স্বামীর নিষেধ উপেক্ষা করেন এবং নিজের প্রস্তুতি শুরু করেন। তিনি পূজার সামগ্রী নিয়ে নদীর তীরে যান, পূজা সম্পন্ন করেন এবং পূজার শেষে কাঁটার শয্যা গ্রহণ করেন। ধর্ম ঠাকুর তাঁর এই নিঃস্বার্থ ভক্তি ও আত্মোৎসর্গে তুষ্ট হন। তিনি রঞ্জাবতীকে পুনর্জীবন দান করেন এবং তাঁকে একটি পুত্রসন্তান দান করেন।

ধর্ম ঠাকুর কিছুটা সময় নিয়ে ঠিক করেন, কে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে রঞ্জাবতীর পুত্র হবে। তিনি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে রঞ্জাবতীর পুত্রই হবে তাঁর champion (প্রতিনিধি) এবং পৃথিবীতে তাঁর উপাসনার প্রচারক। তাই তিনি তাঁর আকাশপুরী বাসী কশ্যপের পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। সেই পুত্রই ছিল লাউসেন, যিনি পৃথিবীতে ধর্ম ঠাকুরের প্রতিনিধি হয়ে উপাসনা প্রচার করবেন। কিন্তু যখন তাঁর মামা মহামদ এই অপ্রত্যাশিত শিশুর জন্মের খবর পান, তিনি রেগে যান এবং পুত্রটিকে অপহরণের জন্য চেষ্টা করেন। ধর্ম ঠাকুর লাউসেনকে রক্ষা করেন, এবং হনুমানকে উদ্ধারকারীরূপে পাঠান। একই সময়, ধর্ম ঠাকুর নিজের মুখ থেকে তার ছোট ভাই, কর্পূরকে, সৃষ্টি করেন। দুই ভাই একে অপরের থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। তাঁরা হনুমানের কাছ থেকে কুস্তি শিখে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সকল চ্যালেঞ্জারদের পরাজিত করে।

এদিকে, দেবী হতাশ হয়ে পড়েন। কারণ ময়নায়, কর্ণসেনার শহরে, কেউই তাঁর পূজা করছে না। তাঁর রাগ সত্ত্বেও, এবং লাউসেনের যুদ্ধ দক্ষতা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে, তিনি লাউসেনকে একটি জাদুকরী তলোয়ার প্রদান করেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই তরুণেরা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা তাদের চাচা গৌড়েশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে রাজধানীতে যাবে, যদিও তাদের বাবা এতে একেবারেই একমত নয়। মহামদ এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে তাদের হত্যা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু আবারও ধর্ম ঠাকুরের হস্তক্ষেপে তিনি ব্যর্থ হন। রাস্তা চলতে চলতে তাদের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। লাউসেন একে একে একটি ভীষণ বাঘ এবং একটি

মানবভক্ষক কুমির হত্যা করে, কিন্তু তাঁর সমস্যা এখানেই শেষ হয় না। এক বাড়ুই (বেতেল চাষী জাতি) নারী তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু লাউসেন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে, সে তাকে হত্যার অভিযোগে ফাঁসিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেয়। তবে ধর্ম ঠাকুর তাকে মুক্ত করেন।

পরবর্তী শহরে, যেখানে মহিলাদের একটি রাজ্য ছিল, রাণী সুরীক্ষা তাকে আটকে রাখার চেষ্টা করেন, তাকে কিছু ধাঁধার উত্তর দিতে চ্যালেঞ্জ করে। কিন্তু লাউসেন উত্তর খুঁজে বের করেন (ধর্ম ঠাকুর দেবীকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন), এবং তাই তিনি রাণীর হাত থেকে পালিয়ে যান।

এদিকে, মহামদ তাঁর ভাতিজাদের নিধন করতে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, এই তরুণেরা চোর এবং যারা তাদের আশ্রয় দিবে, তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তারা একটি পানবরজের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু পরে আশ্রয়দাতার বিপদ এড়াতে তাঁরা সেখান থেকে চলে যায় এবং একটি গাছের তলায় শিবির স্থাপন করে। মহামদ তাদের বিরুদ্ধে রাজকীয় হাতি পাঠায়, এই আশায় যে হাতিটি তাদের হত্যা করবে। কিন্তু হাতিটি লাউসেনকে চিনতে পেরে তাকে আঘাত করতে অস্বীকার করে। এখানে একটি খুব হাস্যকর দৃশ্য ঘটে, যেখানে মহামদ হাতিটিকে মাতাল করতে চায় যাতে হাতিটি তরুণটিকে মেরে ফেলে। মাহুতেরা মদ বিক্রেতার বাড়িতে গিয়ে তার সমস্ত মদ কিনে নিয়ে আসে। সত্যিই হাতিটি ঢালা-ঢালা মদ পান করে। কিন্তু পরে সে রেগে গিয়ে শহরের অনেক বাড়িঘর ভেঙে দেয়। শেষ পর্যন্ত হাতি ও লাউসেনের মধ্যে এক তীব্র যুদ্ধ হয়, এবং লাউসেন হাতিটিকে হত্যা করে (পরে তাকে পুনর্জীবিতও করেন)। মহামদ ভাইবোনদের রাজকীয় হাতি চুরি করার অভিযোগে তাদের কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু রাজা এ খবর পেয়ে তাদের মুক্তি দেন, খুশি হন যে শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর ভাতিজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারলেন। তিনি লাউসেনকে তাঁর প্রাসাদের শ্রেষ্ঠ পশু, এক দেবীয় ঘোড়া প্রদান করেন এবং দক্ষিণ ময়নার দুর্গ ও শহর দান করেন, তারপর তাদের যাত্রার জন্য পাঠিয়ে দেন।

বাড়ি ফেরার পথে তারা কালু ডোম এবং তার ডোমরা সেনের সঙ্গে দেখা করে। এই অঞ্চলে ডোমরা শূকর পালনকারী এবং তারা লাউসেনের যাত্রাপথের পাশে ঘুরছে। লাউসেন তাদের দেখে এতটাই মুগ্ধ হন যে, তিনি তাদের পরিবারের সঙ্গে ময়নায় বসবাস করতে আমন্ত্রণ জানান। প্রথমে কালু কিছুটা দ্বিধা প্রকাশ করেন, তিনি প্রশ্ন করেন যে, শূকর পালকরা কীভাবে এমন এক অভিজাত অঞ্চলে বসবাস করতে পারবে, কিন্তু লাউসেন তাদের জন্য শহরের একটি আলাদা অংশ নির্ধারণ করেন। তিনি কালুকে তার জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত করেন, এবং দুজন খুব ভালো বন্ধু হয়ে ওঠেন।

যখন লাউসেন অঞ্চল জুড়ে বন্ধুত্ব তৈরি করছেন, তার মামা মহামদ ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন। কামরূপের রাজা, এক অন্য ভৃত্য রাজ্য, গৌড়েশ্বর থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, এবং মহামদ এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে তাঁর ভাতিজাদের বিপদে ফেলার পরিকল্পনা করেন। তিনি তাঁর দেবরকে পরামর্শ দেন যে ভাতিজাদের কামরূপে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠানো উচিত। এবং তাই গৌড়েশ্বর তাঁর ভাতিজাকে কামরূপ আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। লাউসেন কালুকে সঙ্গে নিয়ে একটি সামরিক অভিযান শুরু করেন। যখন তারা ব্রহ্মপুত্র নদীতে পৌঁছায়, তারা দেখতে পায় যে নদী প্রচণ্ড ভরপুর, পার হওয়া অসম্ভব। তবে কর্পূরা এমন এক ব্যক্তি, যে অন্যরা যা জানে না, তা সে জানে। তিনি লাউসেনকে জানান যে গৌড়েশ্বরের মায়ের কাছে দুটি জাদুকরী বস্তু রয়েছে: একটি ছুরি, যার ছোঁয়ায় নদীর জল শুকিয়ে যাবে এবং সেনকে নদী পার হতে সাহায্য করবে, এবং একটি মালা যা কামরূপকে পরাজিত করতে সাহায্য করবে। এবং গৌড়েশ্বরের মা তাঁর ভাতিজাকে উক্ত দুটি বস্তু ধার দিয়ে খুশি।

তারা জাদুকরী ছুরি দিয়ে নদী পার হয় এবং মালার সাহায্যে কামরূপের দেবীকে তাঁর মন্দির থেকে নির্বাসিত করে। ফলে তারা শহরটি সহজেই জয় করে। কামরূপের রাজা লাউসেনের সাহসিকতায় এতটাই মুগ্ধ হন যে, তিনি শুধু আত্মসমর্পণ করেননি। বরং লাউসেনকে তাঁর সবচেয়ে সুন্দর কন্যা, কালিঙ্গাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন।

গৌড়েশ্বরের কাছে ফিরতি পথে, লাউসেন আরও দুটি স্ত্রী লাভ করেন: মঙ্গলকোটের রাজার কন্যা অমলা এবং বর্ধমানের রাজার কন্যা বিশালা। এদিকে, গৌড়েশ্বর সিমুলার রাজা হরিপালের যুবতী এবং সুন্দরী কন্যা কানাড়ার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর হাত প্রার্থনা করেন। হরিপাল এতে সম্মতি জানান, তবে তাঁর কন্যা কানাড়া সম্মতি দেন না। ছোটবেলা থেকেই, দীর্ঘদিন আগে, কানাড়ার হৃদয়ে লাউসেনের জন্য এক গভীর ভালোবাসা তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যখন তাঁরা একে অপরকে চিনতেও পারেনি। গৌড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে হরিপালের দরজায় ৯ লাখ সৈন্যসহ উপস্থিত হন। কানাড়া খুবই বুদ্ধিমান, এবং একটি পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি একটি লোহার গণ্ডারের মূর্তি তৈরি করেন এবং বলেন, 'যদি তুমি এই লোহার গণ্ডারকে এক হালকা আঘাতে দুটি টুকরো করতে পারো, তবে আমি তোমায় বিয়ে করব।' যতই চেষ্টা করুক, বৃদ্ধ রাজা লোহার গণ্ডারের উপর একটিও আঁচড় ফেলতে পারেন না। মহামদ তাকে পরামর্শ দেন যে, লাউসেনকে ডেকে আনা উচিত, যিনি একেবারে সহজেই লোহার মূর্তিটি দুই টুকরো করে দেন। যেহেতু লাউসেন আসলে এই কাজটি সফলভাবে করেছেন, কানাডা তাকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু এতে গৌড়েশ্বর আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। শেষে একটি সমঝোতা হয়: তিনি সেই পুরুষকে বিয়ে করবেন, যিনি তাকে একটি সঠিক প্রতিযোগিতায় জিতে জয় করবেন। এবং অবশ্যই, লাউসেন সেই প্রতিযোগিতা জিতে যান। হতাশ বৃদ্ধ সম্রাট তার রাজধানীতে ফিরে যান, এবং লাউসেন ও তার নতুন স্ত্রী ময়নায় ফিরে আসেন।

এদিকে, ইচাই ঘোষ এখনও তাঁর কর পরিশোধ করতে অস্বীকার করছেন। মহামদের প্ররোচনায়, সম্রাট লাউসেনকে ডেকে পাঠান, যাতে তিনি ইচাইয়ের দুর্গ ঢেকুর আক্রমণ করেন। রঞ্জাবতী এবং বিশেষ করে কর্ণসেন এই ধারণার বিরুদ্ধে ছিলেন, তাদের পরিবার গতবার ইচাইয়ের বিরুদ্ধে রণযাত্রা করার পরে কী ঘটেছিল তা মনে রেখে। তবে তরুণ বীর লাউসেন তাঁর পিতামাতার অনুনয়ে কান দেন না এবং ৯ লাখ সেনা নিয়ে অজয় নদী পার হয়ে অভিযান শুরু করেন। ইচাই তাঁর সেনাপতি লোহাটা পাঠান লাউসেনর সাথে যুদ্ধে লড়তে, এবং এক তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়। দুই যোদ্ধাই সমানভাবে শক্তিশালী ছিলেন। শেষে, লাউসেন লোহাটার মাথা বিচ্ছিন্ন করে জয়লাভ করেন। তিনি লোহাটার কাটা মাথা গৌড়েশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু মহামদ এই খবর পেয়ে উপহারটি বাধা দিয়ে দেন। তিনি জাদু ব্যবহার করে মাথাটি লাউসেনর মাথার মতো করে বানিয়ে, তা গৌড়েশ্বরের কাছে না পাঠিয়ে, ময়নায় লাউসেনর পিতামাতার কাছে পাঠিয়ে দেন। বৃদ্ধ কর্ণসেন এবং তার স্ত্রী রঞ্জাবতী অত্যন্ত শোকিত হন যখন তাঁরা কাটা মাথাটি পান, এবং লাউসেনর চার স্ত্রী আত্মদাহের প্রস্তুতি নেন। এটি দেখে, ধর্ম হনুমানকে ছদ্মবেশে পাঠান তাদের সত্য জানাতে। হনুমান ব্যাখ্যা করেন যে, যুদ্ধে দুপক্ষই সমান সাহসিকতা প্রদর্শন করেছে। ধর্ম লাউসেনকে রক্ষা করেছেন, আর পার্বতী ইচাইকে রক্ষা করেছেন। তার অসীম সাহস সত্ত্বেও, ইচাই এবং তাঁর সমস্ত সেনাপতি অবশেষে কালী এবং তাঁর ডোম সেনার হাতে যুদ্ধে নিহত হন, এবং জয় লাউসেনের হয়। এরপর কাটা মাথাটি নারীদের জন্য প্রস্তুতকৃত শবদাহের চুল্লিতে ছুঁড়ে ফেলা হয়, এবং যখন মোম গলতে শুরু করে, লোহাটার চেহারা প্রকাশিত হয়, তখন সবাই দেখে হনুমান সত্যিই তাদের সত্য বলেছিলেন।

তারপর যুদ্ধে ফিরে, কালী প্রথমে ইচাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু কালী জানত না যে, দেবী ইচাইকে একটি জাদুকরী তীর দিয়েছেন, যা সবসময় তাঁর লক্ষ্যভেদ করে। সেই তীর দ্বারা কালু মারা যান, এবং অবশেষে লাউসেন ইচাইকে হত্যা করেন, যখন দেবী তাঁর সাময়িকভাবে তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। এই মুহূর্তে ধর্ম হস্তক্ষেপ করেন, কালুকে পুনর্জীবিত করেন এবং ইচাইকে স্বর্গে পাঠান।

এখন মহামদ বুঝতে পারলেন যে, লাউসেনর শক্তি তাঁর ধর্ম ঠাকুরের প্রতি ভক্তি থেকে আসে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনিও ওই দেবতার পূজা করবেন। তবে ধর্ম ঠাকুর বোকা নন, এবং জানেন যে, মহামদ কেবল তাঁর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁকে পূজা করছেন। ধর্ম মহামদের পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে শুরু করেন। গৌড়ায় অবিরাম বৃষ্টি শুরু হয়, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো শহর ডুবে যায়। গৌড়েশ্বর আবার লাউসেনকে সাহায্য করতে ডেকে পাঠান। লাউসেন অবশ্যই রাজি হন, এবং এবার তাঁকে হাকন্দা যেতে হবে, যেখানে তিনি ধর্ম ঠাকুরের জন্য সবচেয়ে বিস্তারিত পূজা করবেন, গৌড়েশ্বরের সমস্ত পাপের শাস্তি হিসেবে, এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠানোর জন্য। সেই পশ্চিমমুখী সূর্যোদয়ই হবে সেই চিহ্ন, যাতে সবাই মানবে যে, সবাই ধর্ম ঠাকুরের পূজা করছে। লাউসেন তাঁর দুর্গ এবং পরিবার কালুকে হস্তান্তর করে, এবং পুরোহিত সামুল্যা, হরিহর বাইটি তবলা বাদক, একটি কুকুর এবং হনুমানকে সাথে নিয়ে কঠোর তপস্যায় লিপ্ত হন। তিনি নিজের শরীরকে নয়টি অংশে ভাগ করেন, এবং প্রতিটি অংশকে দেবতার কাছে বলি হিসেবে উৎসর্গ করেন।

এদিকে, লাউসেন যখন দূরে রয়েছেন এবং তাঁর শহরকে রক্ষা করতে পারবেন না, তখন মহামদ ময়নায় আক্রমণ চালায়। সে একটি নিদ্রা মন্ত্র দিয়ে আক্রমণ শুরু করে। শহরের সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, এবং মহামদের ৯ লাখ সৈন্য শহরের ভিতরে প্রবেশ করে। প্রায় পুরো শহরই ঘুমিয়ে থাকলেও, কালুর স্ত্রী লক্ষ্যা, যিনি ধর্ম ঠাকুরের পূজা করছিলেন, জেগে ছিলেন। হনুমান কালুকে স্বপ্নে এসে বললেন যে, দেবীর পূজা করতে হবে যদি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চান। কালু জেগে উঠলেন এবং পূজা শুরু করলেন। কিন্তু ডোম, যিনি ভালো খাবার এবং পানীয়ের প্রতি দুর্বল, দেবীর জন্য রাখা উপহারগুলি দেখে তা লোভের সাথে খেয়ে ফেলেন। এখন তিনি মাতাল হয়ে গেছেন এবং যুদ্ধ করতে অক্ষম (মদও দেবীর উপহারের মধ্যে ছিল)। তবে তার স্ত্রী এবং অন্যান্য ডোম মহিলারা দ্রুত বুঝতে পারলেন যে তাদের পরিস্থিতি কতটা গুরুতর। কালুর স্ত্রী লক্ষ্যা এককভাবে মহামদের সেনাদেরকে নদী পর্যন্ত তাড়িয়ে দেন, যখন প্রায় সবাই নিহত হয়ে গেছে। তার স্বামী অবশেষে তার অনুভূতি ফিরে পেয়ে যুদ্ধে যোগ দেন, কিন্তু এক চালে নিহত হন। তারপর মহামদের সেনারা রাণী কালীংগাকে বন্দি করে, যিনি দ্রুত নিজের পেটের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে আক্রমণকারীদের শিকার হওয়ার হাত থেকে বাঁচেন। রাণী কালিংগা তখন যুদ্ধে যোগ দেন এবং দেবীর সাহায্যে সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন।

লাউসেন তখনও তাঁর পূজায় ব্যস্ত। কিন্তু বন্যা থামাতে এবং পশ্চিমে সূর্য উঠাতে সফল হননি। তখন সামুল্যা তাকে বলেন যে, দেবতার কাছে নিজের মাথা বলি দিতে হবে, যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে লাউসেন কতটা গুরুতর। রাজপুত্র এবং পুরোহিত দুজনই মারা যান, এবং কেবল কুকুরটি বাকি থাকে পাহারা দেওয়ার জন্য। অবশেষে ধর্ম ঠাকুর সন্তুষ্ট হন এবং পুরো দেবমণ্ডলীসহ উপস্থিত হয়ে লাউসেন ও অন্যদের জীবিত করে তোলেন এবং সূর্যকে পশ্চিমে উঠার নির্দেশ দেন। এবং তারপরও মহামদ তাঁর ক্ষোভ পুষে রাখে। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে সূর্যোদয়টি মিথ্যা ছিল। তিনি হরিহর তবলা বাদককে অর্থ দিয়ে রাজা আদালতে মিথ্যা বলানোর জন্য প্ররোচিত করেন। কিন্তু হরিহর সত্য কথা বলেন। মহামদ, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য রেগে গিয়ে হরিহরকে খুঁটির উপর খোঁচানোর আদেশ দেন। তবে ধর্ম ঠাকুর আবার তাকে বাধা দেন, হনুমানকে পাঠিয়ে হরিহরকে স্বর্গে নিয়ে যান।

এরপর মহামদ মনে করেন, নিজের পরিবারের জন্য এক সোনালী সুযোগ তিনি পাচ্ছেন: যদি কাউকে কাঁটার উপর বসানো হয় আর ঈশ্বর তাকে স্বর্গে নিয়ে যান, তাহলে, মহামদ ভাবেন, "আমি যদি একই কাজ করি, তাহলে আমার ছেলেরাও সবাই রক্ষা পাবে।" এভাবেই তিনি একে একে নিজের ছয় ছেলেকেই কাঁটার উপর বসান। কিন্তু হনুমান কখনও আবির্ভূত হন না, এবং ছেলেরা মারা যায়। অবশেষে মহামদের প্রতারণা প্রকাশ পায় এবং তিনি জনসমক্ষে লজ্জিত হন। লাউসেন কনিষ্ঠ ছেলেটিকে পুনর্জীবিত করেন, কিন্তু মামাকে কুষ্ঠরোগে অভিশাপ দেন। তখন গৌড়েশ্বর, করুণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, লাউসেনকে বোঝান যেন তিনি অভিশাপটা একটু হালকা করেন—যাতে করে কেবল একটিমাত্র সাদা দাগ মামার মুখে থেকে যায়, যা তাঁর অসৎ আচরণের স্মারক হয়ে থাকবে।

লাউসেন ও কালু ফিরে যান ময়নায় এবং তাঁদের জীবনের বাকি দিনগুলো সুখে কাটান। লাউসেন ধর্মঠাকুরের উপাসনার প্রচার করেন এবং এক সময় তিনি তাঁর স্ত্রীগণ, ভাই, পিতা-মাতা ও অন্যান্য ধর্মভক্তদের সঙ্গে স্বর্গে গমন করেন, আর তাঁর সিংহাসন উত্তরাধিকারসূত্রে পায় তাঁর পুত্র চিত্রসেন। আর কালু ডোম পৃথিবীতে রয়ে যান—কারণ স্বর্গে মদ নেই। এবং এই হল আমাদের কাহিনি, যা আজও বর্ধমান জেলায় বারো রাত ধরে পরিবেশন করা হয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ, এবং *ধর্মমঙ্গল*-এর সঙ্গে মানবাধিকারের সম্পর্ক কী?

"মহাকাব্য হলো এমন এক ধরনের বর্ণনা যা একটি জাতির ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলে। এগুলো সুনির্দিষ্ট ঘটনার সঠিক বিবরণ দেয় না, বরং অতীত সম্পর্কে একটি যৌথ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে, যা নানা জনপরম্পরাকে ব্যাখ্যা করে ও একত্রিত করে।"

আমরা যদি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করি কোন জিনিসগুলো একটি মহাকাব্যে গুরুত্ব পায়, তাহলে সেই মহাকাব্য যে গোষ্ঠী দ্বারা রচিত, তাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা সম্ভব। কী ধরনের চরিত্রগুণকে সেখানে আকাঙ্ক্ষিত বলে দেখানো হচ্ছে, এবং সেগুলো কি পরিবর্তনশীল—অর্থাৎ জাতিভেদ-নির্ভর—না কি সর্বজনীন? কী ধরনের কর্মকাণ্ড বা ঘটনা তারা তুলে ধরে, এবং কী উপেক্ষা করে? কে কার সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং কোন প্রেক্ষিতে?

ডেভিড কারলি যুক্তি দিয়েছেন যে *ধর্মমঙ্গল* সেই প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে যে "বাঙালি হিন্দুর সংস্কৃতিতে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা বা সামরিক গুণের অভাব ছিল"[৫]—এই সমালোচনাটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা করেছিলেন। ফ্রাঞ্জ ভট্টাচার্যও এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেন। তবে তাঁর আগ্রহ নায়কসুলভ পুরুষত্বের চিত্রায়ণে নয়—যা জাতিভেদ অতিক্রম করে—বরং জাতি (caste) বিষয়ে। তিনি বলেন—এবং এর জনপ্রিয়তাও তাঁর দাবিকে সমর্থন করে—যে *ধর্মমঙ্গল* রচয়িতাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁরা ব্রাহ্মণ হলেও[৬], এই কাহিনি আদৌ ব্রাহ্মণদের গল্প নয়। এর চরিত্রদের মধ্যে খুব কমজনই ব্রাহ্মণ, এবং তাদের ভূমিকাও সামান্য। কিন্তু প্রশ্ন তুলেছেন তিনি, আমরা কি বলতে পারি যে *ধর্মমঙ্গল* একটি নিম্নবর্ণের মহাকাব্য? এর নায়ক লাউসেন কখনও নিজের জাতপরিচয় বলেন না, কিন্তু অনেক নিম্নবর্ণের চরিত্র স্পষ্টভাবে চিহ্নিত। তাঁর শত্রু ইচ্ছাই ঘোষকে (গোপ, গোপালক) বারবার তাচ্ছিল্য করে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু লাউসেনর প্রিয় সঙ্গী কালু, যিনি ডোম, জাতিতে অনেক নিচু হলেও[৭], এক সাহসী যোদ্ধা হিসেবে উঠে আসেন—জটাজুটধারী, বাকলবস্ত্র পরিহিত। কালু যেন এক ধরণের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেন—একদিকে বনবাসী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে, আরেকদিকে বন্য শিকারি ও দস্যুদের সঙ্গে; তেমনি রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের সঙ্গে সাধারণ চাষাভুষো প্রজাদের মধ্যেও। রূপরাম বারবার বলেন, "ধর্মসেবায় বর্ণভেদ করা উচিত নয়,"[৮] এবং কাহিনির বহু অ-অভিজাত চরিত্রের গুরুত্ব তাঁর কথাকে শক্তি জোগায়। সম্ভবত এখানেই আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের একটি মডেল দেখতে পাই।

শ্রীমতী ভট্টাচার্য এই মহাকাব্যে এক ধরনের টানাপোড়েন চিহ্নিত করেন, তবে তা আন্তর্বর্ণীয় দ্বন্দ্ব নয়—বরং সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যকার ক্ষমতার লড়াই।

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, *ধর্মমঙ্গল* প্রচলিত সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসকে উল্টে দেয় না। এই পাঠ শাসকদের অধিকার ও কর্তব্যকে সমর্থন করে, যেখানে সমাজের সব স্তরের মানুষ—তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী—অংশগ্রহণ করে। এমনকি মঙ্গলকাব্যের ভক্তিবাদও প্রথাগত শ্রেণিবিন্যাস ও অভিজাতদের প্রাধান্যকেই জোরদার করে। তবুও, রূপরামের কাব্যনির্মাণ "নিশ্চিতভাবেই গ্রামীণ বাঙালি সমাজের একটি মহাকাব্য—একটি সমাজ, যেখানে নিম্নশ্রেণির মানুষেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।"[৯]

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে ঔপনিবেশিক যুগের আগেও—যদি আমরা মহাকাব্যটিকে তার সরল রূপে গ্রহণ করি—তাহলে বোঝা যায়, সমাজের নানা স্তরের মানুষ একে অপরের সঙ্গে নিয়মিত মিশতেন, একসঙ্গে বাস করতেন ও কাজ করতেন। আর আমাদের মধ্যে যাঁরা নারী, তাঁদের জন্য তো এটা অবাক করার কিছু নয় যে—পুরুষেরা যখন অক্ষম প্রমাণিত হন, তখন নারীরাই এগিয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দেন।

এক সময় আমরা জানতাম কীভাবে একসঙ্গে বসবাস করতে হয়। জানতাম কীভাবে একে অপরকে সাহায্য করতে হয়। তাহলে কেন আমরা এখনো একে অপরকে মৌলিক মানবিক চাহিদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছি? আমরা যারা কিছুটা সুবিধাপ্রাপ্ত, তারা কি নিজেদের সুবিধা হারানোর ভয়ে এতটাই আতঙ্কিত যে, তা ভাগ করে নিতে চাই না?

মার্থা নুসবাউম মানবাধিকারের সংজ্ঞা দেন এভাবে, "এটি একটি বিশেষভাবে জরুরি এবং নৈতিকভাবে ন্যায়সঙ্গত দাবি যা একজন ব্যক্তির আছে, কেবলমাত্র মানুষ হওয়ার কারণে, এবং এটি জাতি, শ্রেণি, লিঙ্গ, জাতিগত বা ধর্মীয় বা যৌন বা লিঙ্গীয় পরিচয় নিরপেক্ষ।" (বেইটস, পৃ. ৬৩)। নুসবাউম উল্লেখ করেন যে, আমরা এক সময় একটি জাতির জীবনমান মাপতাম মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNP) দেখে। তবে এই হিসাব শুধুমাত্র আমাদের গড় আয় দেয়। এটি সেই মানুষের কথা বিবেচনায় নেয় না, যারা তাদের প্রাপ্য অংশের চেয়ে অনেক কম পান, অথচ কেউ কেউ অনেক বেশি সম্পদ ভোগ করেন। এটি এমনকি শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার, ভোটাধিকার, বা বিভিন্ন লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য সমতা ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করে না। অর্থাৎ, এটি কি সমাজের কেবল সম্পদশালীর সুবিধা দেয়?

তবুও, একজন ধনী ব্যক্তি যদি তার সম্পদের কোন কিছু হারান, তবে সে বঞ্চিত অনুভব করতে পারে। আর সুবিধাবঞ্চিত মানুষরা তাদের পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে শিখতে পারে এবং তা সহ্য করতে পারে। ব্যবস্থাগত বৈষম্যের শিকার ব্যক্তিরা এক সময় ধারণা করতে শুরু করতে পারে যে তারা হয়তো প্রকৃতপক্ষে অযোগ্য। আমরা এটি বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দেখতে পাই, যেখানে নারীদের অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, যা উন্নত বিশ্ব সহজেই স্বীকৃতি ও গ্রহণ করে। নুসবাউম "ক্ষমতাসম্পন্নতা পদ্ধতি" গ্রহণের পক্ষে যুক্তি দেন, যার মাধ্যমে আমরা প্রশ্ন করি একজন ব্যক্তি আসলে কী করতে এবং হতে পারে। এই পদ্ধতি সমাজকে সমগ্রভাবে না দেখে, বরং ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কাজ করে এবং কীভাবে স্থানীয় উপলভ্য সম্পদ একজন ব্যক্তিকে মানুষ হিসেবে কাজ করতে সক্ষম করে, তার উপর ফোকাস করে। তিনি এমন কিছু নীতির সন্ধান করেন যা ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মানুষরা সুখের অনুসন্ধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে একমত হতে পারে।

তিনি এই চিন্তাগুলো দুই দশক আগে তৈরি করেছিলেন, কিন্তু আজও এগুলো যথেষ্ট অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়। এখানে তার তালিকাটি দেওয়া হলো: আপনি দেখতে

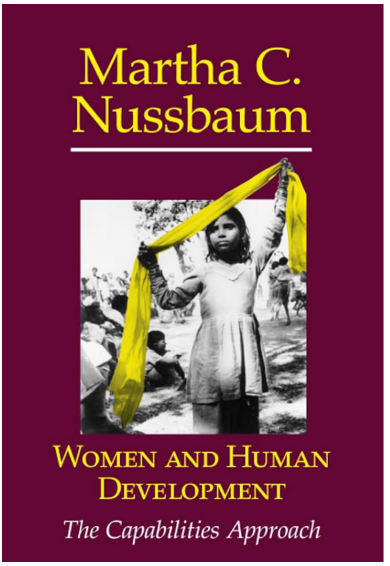

মার্থা নুসবাউম ও তাঁর প্রণীত মানবাধিকার বিষয়ক একটি গ্রন্থের প্রচ্ছদ

পাবেন যে নুসবাউম আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যের প্রতিও মনোযোগ দিতে বলছেন।

১. জীবন—স্বাভাবিক দীর্ঘ জীবন যাপন করার সামর্থ্য;
২. শরীরিক স্বাস্থ্য—ভালো স্বাস্থ্য, পর্যাপ্ত পুষ্টি, ও যথাযথ আশ্রয়ের অধিকার;
৩. শরীরগত স্বকীয়তা—বাধা বা আক্রমণ ছাড়াই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সামর্থ্য; প্রজনন সংক্রান্ত পছন্দের সুযোগ;
৪. ইন্দ্রিয়, কল্পনা, চিন্তা—কল্পনা করা, চিন্তা করা, যুক্তি প্রয়োগ করা, এবং যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে তা বিকাশ করা; শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে কল্পনা ও চিন্তা প্রয়োগ করার সামর্থ্য এবং মতপ্রকাশ ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা;
৫. ভাবাবেগ—অপরাপর মানুষ ও বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকার সক্ষমতা; যারা আমাদের ভালোবাসে তাদের ভালোবাসা, তাদের হারানোর বেদনা অনুভব করা; ভয় বা উৎকণ্ঠা ছাড়াই অনুভূতি প্রকাশ করার সামর্থ্য;
৬. ব্যবহারিক যুক্তিবোধ—"ভালো" কী তা বোঝা এবং নিজের জীবনের জন্য পরিকল্পনা তৈরির সক্ষমতা;
৭. সম্পৃক্ততা (Affiliation)—অন্যদের সঙ্গে ও অন্যদের জন্য বাঁচার সামর্থ্য; তাদের কল্যাণের প্রতি যত্নশীল হওয়া; এমন প্রতিষ্ঠানসমূহকে রক্ষা করা যা এই সম্পৃক্ততাকে পালন করে; বাকস্বাধীনতা ও সমাবেশের স্বাধীনতা; একজন মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে গণ্য হওয়ার অধিকার; ক. বন্ধুত্ব, খ. সম্মান
৮. অন্য প্রাণী ও প্রজাতি—প্রাণ-প্রকৃতির সঙ্গে বসবাস করা এবং তার প্রতি দায়িত্ববোধ থাকা;
৯. বিনোদন—হাসতে পারা, খেলতে পারা, এবং অবসরে আনন্দ উপভোগ করার সামর্থ্য;
১০. নিজ পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ: ক. রাজনৈতিক, খ. বস্তুগত

এই সবগুলো সক্ষমতা থাকা জরুরি; একটির অতিরিক্ত থাকা অন্যটির অভাব পূরণ করতে পারে না। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রতিটি ক্ষেত্রে সামর্থ্য থাকা—যেমন,

আপনি ইচ্ছাকৃত উপবাস রাখতে পারেন, যদি আপনার খাদ্যপ্রাপ্তি সহজলভ্য হয়। সেটা জোরপূর্বক অনাহারের মতো নয়। অবশ্যই, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে আমাদের কিছু নির্দিষ্ট অধিকার থাকার বিষয়টি অনেক সময় নির্ভর করে আমাদের রাষ্ট্র সেগুলো স্বীকৃতি দেয় কি না তার উপর। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার সংবিধান লিঙ্গসমতার নিশ্চয়তা দেয়, কিন্তু নাগরিক আইন যে প্রধান ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলোর উপর ভিত্তি করে গঠিত, সেগুলো যদি লিঙ্গসমতাকে স্বীকার না করে, তাহলে কী ঘটে? এমন পরিস্থিতিতে, নারীদের কাগজে-কলমে অধিকার থাকতে পারে, কিন্তু সেই অধিকার প্রয়োগ বা ব্যবহার করার সামর্থ্য তাদের নাও থাকতে পারে।

অত্যন্ত সাধারণ একটি অধিকার—দারিদ্র্যসীমার উপরে বেঁচে থাকার অধিকার, বা একটি মানসম্পন্ন জীবনের অধিকার এই, অধিকার নিয়েও ভাবা দরকার। সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলতে অতিরিক্ত সম্পদ বরাদ্দের প্রয়োজন হতে পারে। ভারতের সরকার এই চেষ্টাই করেছে—সংরক্ষণের (reservation) মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশে সরকার মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত করতে অভিভাবকদের জন্য ভর্তুকি দিয়েছে, যাতে মেয়েরা শিক্ষার মাধ্যমে পরিবারে অবদান রাখতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০-এর দশকে প্রেসিডেন্ট জনসনের আমলে নাগরিক অধিকার আইনের অংশ হিসেবে Affirmative Action প্রোগ্রাম চালু করা হয়, যাতে পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠীগুলোকে এগিয়ে আনার সুযোগ দেওয়া যায়। সাধারণভাবে এই উদ্যোগগুলো সফলই হয়েছে, যদিও সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা এসেছে, কারণ তারা মনে করেছে, এই পদক্ষেপগুলো তাদের দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করে আসা সুবিধাগুলোর ওপর হুমকি সৃষ্টি করছে।

আমি নিজে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক একজন আমেরিকান গবেষক। আমার নিজের দেশ, বর্তমানে, এইসব মানবাধিকার-সম্পর্কিত আদর্শ অনুসরণ করছে, এমনটা বলা যায় না। যদিও আমাদের সাবেক ফার্স্ট লেডি এলিনর রুজভেল্ট ছিলেন ১৯৪৮ সালের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের প্রণেতাদের একজন, তবুও আজ আমরা নিজেদের অনেক নাগরিককেই ভোটাধিকার, স্বাস্থ্যসেবা, এবং মানসম্পন্ন শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি। কয়েক বছর আগে আমরা সীমান্তে ছোট ছোট শিশুদের তাদের বাবা-মার কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্র ওই ১৯৪৮ সালের ঘোষণাপত্র থেকে নিজেদের স্বাক্ষর প্রত্যাহার করেছে, এবং এরপর আমরা জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ থেকেও সম্পূর্ণভাবে সরে দাঁড়িয়েছি। এবং এখন, গাজায় ছোট ছোট শিশু অনাহারে ভুগছে, এমনকি নিহত হচ্ছে, আর সেই সময়ে আমেরিকান শিক্ষার্থীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে নিজেদের দেশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে।

আমি বিশ্বাস করতে চাই যে, আমি বিশ্বের সবচেয়ে আলোকিত, প্রগতিশীল রাষ্ট্রে বসবাস করি। আমরা সবাই-ই তো তাই চাই, তাই না? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে আমরা বিশ্বের কাছে খুব একটা ভালো উদাহরণ স্থাপন করতে পারছি না। তবুও, সম্প্রতি আমাদের দুই দেশের রাস্তায় যা দেখা যাচ্ছে, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, বিশেষ করে আমাদের তরুণ প্রজন্ম চেষ্টা করে চলেছে আমাদের সেই উচ্চ আদর্শগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে, যেগুলো আমরা মুখে বলি, কিন্তু কাজে পালন করি না। আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। তরুণ গ্রেটা থুনবার্গকে টাইম ম্যাগাজিন "পার্সন অফ দ্য ইয়ার" ঘোষণা করেছিল, কারণ তিনি নিরলসভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতার বিপদ সম্পর্কে আমাদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। ঢাকায় স্কুলশিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছে বেপরোয়া চালকদের বিরুদ্ধে, যারা স্কুলবাসের জন্য অপেক্ষমাণ শিশুদের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। আমেরিকান কিশোর-কিশোরীরা শক্তিশালী ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন (NRA)-এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে,

অস্ত্র সহিংসতার প্রতিবাদে। বিশ্বজুড়েই ছাত্রছাত্রীরা রুখে দাঁড়িয়েছে। নারীদের ওপর যে পদ্ধতিগত নিপীড়ন চলছে, বিশেষ করে নিজেদের শরীর, জীবন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নিয়ে, তা নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে নারী অধিকার শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে। এবং আমরা দেখছি, শুধু আমেরিকার নয়, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া এবং আরও বহু দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহানুভূতিশীল ও সচেতন শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমেছে, সরকারকে গাজায় যুদ্ধ থামাতে আহ্বান জানাচ্ছে।

গণতন্ত্রে নাগরিকদের অধিকার তো আছেই, কিন্তু অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করা তাদের দায়িত্বও। তবে কখনো কখনো অন্য কারো অভিজ্ঞতা কল্পনা করাও কঠিন হয়ে পড়ে, অজানা কারো প্রতি সহানুভূতি বোধ করাটাও সহজ হয় না। আর ঠিক সেই কারণেই সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ। আমি সবার প্রতি আহ্বান জানাই, সাহিত্যকে গুরুত্ব দিন। পড়াশোনা আমাদের আরও সচেতন করে তোলে, আরও মেধাবী করে তোলে। পাঠের মাধ্যমে আমরা এমন মানুষদের চিনতে শিখি, যারা হয়তো আমাদের মতো নয়, হয়তো ভিন্ন দেশের, ভিন্ন পেশার, ভিন্ন রকমের চ্যালেঞ্জে জর্জরিত। আর যখন আমরা এই ভিন্ন ভিন্ন, এমনকি বহু দূরের মানুষদের জীবন সম্পর্কে জানতে শুরু করি, তখন যদি আমরা সামান্যতম ভালো মানুষও হই, তবে আমরা আরও সদয় হয়ে উঠি, আরও সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি। এবং সেই সদয়তা শুধু তাদের প্রতি নয়, বরং আমাদের আশেপাশের মানুষদের প্রতিও। কারণ সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা মানুষকে আরও ভালোভাবে বুঝতে শিখি।

বীরেন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের "রাস্তা কারও একার নয়" আমরা এই কথা পাই:

> ধর্ম যতদিন দুঃখী মানুষকে বেঁচে থাকার সাহস দেয়, ততদিন রাস্তা নিয়ে
> কারও সঙ্গে তার ঝগড়া থাকে না। রাস্তা কারও একার নয়।
> বরং তাকেই একদিন রাস্তা ছাড়তে হয়, যার স্পর্ধা আকাশ ছুঁয়ে যায়।

প্রিন্স লাউসেনর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হল কালু ডোম, যিনি একজন শূকরপালক। তাঁর কাকা গৌড়েশ্বরের দরবারে উপস্থিত থাকেন বাংলার সব ধরনের মানুষের প্রতিনিধি হয়ে—চিরস্থায়ী বাসিন্দা হোক কিংবা অভিবাসী: পাঠান, মোগল, আশেপাশের হিন্দু সামন্তরাজা—আরও অনেকে। প্রত্যেকের প্রতিনিধিত্ব আছে, এবং প্রত্যেকেরই

বাংলা একাডেমির শহিদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে বক্তৃতারত রেবেকা মানরিং, পাশে নোট নিচ্ছেন ভাবনগর ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ও ভাবনগর জার্ণালের সহযোগী সম্পাদক নূরুননবী শান্ত

একটি কণ্ঠস্বর আছে। যদি আমরা অতীতে একসাথে বসবাস করতে পারি, তবে নিঃসন্দেহে বর্তমানেও পারি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললে—*যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।*

তবে লক্ষ্য হওয়া উচিত সকলের কণ্ঠস্বরকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলা, যেন ভবিষ্যতের পৃথিবী হয়ে উঠতে পারে আরও মানবিক, আরও সহনশীল।

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তাঁর মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মানুষত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা, আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়—তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সমুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যেমন কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন–

> গাহি সাম্যের গান–
> মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!
> নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
> সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি–

তথ্যনির্দেশ

১ A meter based on number of syllables rather than vowel length, in rhymed couplets.

২ David L. Curley, *Poetry and History: Bengali Maingal-Kābya and Social Change in Precolonial Bengal*, 2008, P. 148

৩ The word may be derived from Sanskrit *garjana*, 'roaring.' A popular folk etymology derives it from *gāṃ/grāma* 'village' + *jana* 'people,' to indicate something performed by villagers. Nicholas (p. 21) says that Rūparāma is the first to use the term, and uses it to mean "the worship of Dharma through asceticism and, ultimately, self-immolation." In subsequent *Dharma Maṅgala*s, *gājan* is simply "worship of Dharma."

৪ Literally, "very deluded," but also perhaps deliberately, very close to the name of the Prophet.

৫ Curley, p. 143.

৬ F. Bhattacharya, p. 360.

৭ F. Bhattacharya, p. 372.

৮ F. Bhattacharya, p. 373.

৯ F. Bhattacharya, p. 383.

প্রবন্ধটি বাংলা একাডেমি ও ভাবনগর ফাউন্ডেশন আয়োজিত সেমিনারে পঠিত। আংশিক ইংরেজি থেকে নূরুননবী শান্ত কর্তৃক বাংলায় অনূদিত।

খণ্ড ১৯, সংখ্যা ২৩
Vol. 19, No. 23

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

জুন ২০২৫
June 2025

doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.2

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহৎ চরিত্র

দং ইউছেন

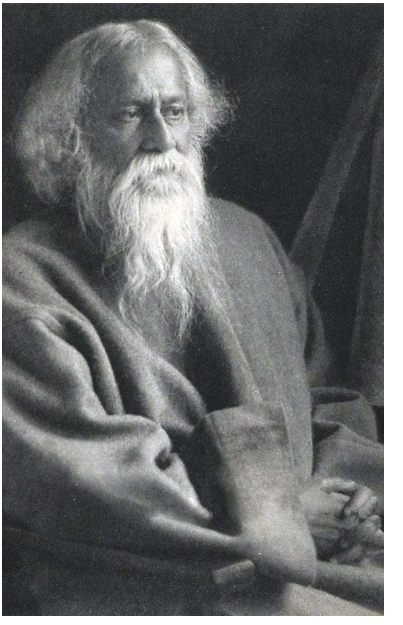

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে, ছবি: উইকিপিডিয়া

The Noble Character of Rabindranath Tagore

Dong Youchen

Abstract

This article explores the noble character of Rabindranath Tagore, one of the most influential literary and cultural figures of South Asia and the first Asian Nobel laureate in literature. While Tagore's literary legacy is widely recognized in China, his personal virtues and humanistic spirit remain relatively less known to the Chinese people. The author aims to highlight the moral greatness of Tagore's character through a detailed examination of his family background, personal relationships, and social commitments.

Drawing from Tagore's rich familial legacy of education, philanthropy, and ethical integrity, the article illustrates how these values deeply shaped his personality. Particular attention is paid to his unwavering love and responsibility toward his wife and children, his compassionate treatment of poor farmers during his time as a zamindar, and his establishment of rural reform initiatives, including schools, hospitals, roads, and agricultural cooperatives.

The article also discusses Tagore's profound sense of justice and moral courage. His fearless criticism of British imperialism, Japanese militarism, and fascist ideologies featured his commitment to global humanism. Tagore's denunciation of the British opium trade in China, his protest against the 1919 Jallianwala Bagh massacre by renouncing his knighthood, and his outspoken opposition to Japanese and Italian expansionism are cited as key examples of his moral clarity and principled activism.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে ১৮৬১—৭ আগস্ট ১৯৪১) দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রবন্ধকার, চিত্রশিল্পী, শিক্ষাবিদ এবং সমাজকর্মী ছিলেন। আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জনের পর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ্যাতি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর রচনা একে একে বিশ্বের বহু দেশের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। ২০ শতকের ২০-এর দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা চীনে প্রবেশ করতে শুরু করে। সে সময় চীনের একদল সংস্কৃতিবিদ ইংরেজি ভাষা থেকে তাঁর রচনাগুলিকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। ফলে চীনের বৃহত্তর পাঠকমহল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়।

বিদেশি সাহিত্যে আগ্রহী চীনা পাঠকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অপরিচিত নন। অনেকেই তাঁর বহু সাহিত্যকর্ম এবং তাঁর সাহিত্য নিয়ে লেখা প্রবন্ধ পড়েছেন। তবে ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তুলনামূলকভাবে কম। আজ আমি আমার প্রবন্ধের মাধ্যমে চেষ্টা করব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থাপন করতে এবং আশা রাখি তাঁর উজ্জ্বল মহিমা আমাদের মন ও আত্মাকে আলোকিত করবে। আমাদের চীনাসমাজের আত্মশুদ্ধি এবং চরিত্র গঠনের পথে তাঁর মতাদর্শ পথপ্রদর্শক হবে, যাতে আমরা মহৎ নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হতে পারি।

প্রবন্ধের এই মহান কবির পরিবার সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা যাক। "ঠাকুর"—হল তাঁদের পারিবারিক উপাধি। তবে, কবির প্রজন্ম থেকে প্রায় পাঁচটি প্রজন্ম পূর্বে তাঁদের পরিবার এই উপাধিটি ব্যবহার করত না। সেই সময় তাঁদের উপাধি ছিল "কুশারী"। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, "কুশারী" কীভাবে "ঠাকুর"-এ রূপান্তরিত হলো? এর পেছনে রয়েছে চমৎকার একটি গল্প। "ঠাকুর"-পরিবারে পূর্বপুরুষদের মধ্যে শূকদেব কুশারী এবং তার ভাইপো পঞ্চানন কুশারী তাদের জন্মস্থান ত্যাগ করে কলকাতার "মেছুয়াবাজার" এলাকায় জীবিকা নির্বাহের জন্য আসেন। এর কাছেই আরও একটি ছোট গ্রাম ছিল—গোবিন্দপুর (বর্তমানে একস্থানেই স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম)। এই গ্রামে হুগলী নদীর তীরে বহু নিম্নজাতির মানুষ বাস করতেন। পঞ্চানন কুশারী এবং তার কাকা শূকদেব কুশারী গ্রামে এসে খুবই সাধারণভাবে বসবাস করতে থাকেন। গ্রামের লোকেরা জানত তারা ব্রাহ্মণ এবং তাদের খুব সম্মান করতো, তারা তাদের "ঠাকুর" বলে সম্বোধন করত, এই শব্দটির বাংলা অর্থ "বাবু" বা "প্রভু"। তখন ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্টিমার হুগলি নদীর মাধ্যমেই জিনিসপত্র পরিবহন করত। পঞ্চানন ও তার কাকা সেই সময় ইংরেজ কাপ্তেনদের এবং কুলিদের খাদ্যসামগ্রী, জল সরবরাহের কাজ করতেন। ফলত

কাপ্তেন এবং কুলিরাও পঞ্চাননকে 'ঠাকুর' বলে ডাকতেন। ইংরেজরাও তাদেরকে এই নামেই সম্বোধন করত এবং তারা এটিকে পদবী বলে মনে করত। ইংরেজদের সঠিক উচ্চারণের অভাবে "ঠাকুর" ক্রমে "Tagore" বলে অভিহিত হতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে, পঞ্চানন ও তার কাকা "ঠাকুর" পদবী গ্রহণ করেন।

এই বিশ্ববরেণ্য কবির নাম রবীন্দ্রনাথ তিনটি বাংলা শব্দ রবি, ইন্দ্র এবং নাথ দ্বারা গঠিত। রবি শব্দের অর্থ সূর্য, ইন্দ্র হলেন ভারতীয় পুরাণে স্বর্গের দেবতা, যা চীনের প্রাচীন দেবসম্রাটের বা বজ্রদেবতার সমতুল্য, নাথ হল একটি প্রত্যয়, যার অর্থ "স্বামী" বা "প্রভু"। রবি+ইন্দ্র+নাথ একত্রে হয়ে "রবীন্দ্রনাথ" শব্দটি গঠিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত "অ" উচ্চারিত হয় "ও"-এর মতো, আর দীর্ঘ "আ" উচ্চারিত হয় "আ"-এর মতো। তাই বাংলা ভাষার সঠিক উচ্চারণ অনুসারে এটি "রবীন্দ্রনাথ" হওয়া উচিত। তবে, চীনারা সাধারণত "Rabindranath" শব্দটির ইংরেজি বানানটি অনুসরণ করে থাকেন, এজন্য যারা বাংলা ভাষা জানতেন না, তারা পূর্বে এটিকে "拉宾德拉纳特" (Raabindraath) হিসেবে অনুবাদ করেছেন।

ভারতে সাধারণত কবিকে "রবীন্দ্রনাথ" বা "রবীন্দ্র" নামে সম্বোধন করা হয়। পরিবারের সদস্য বা বন্ধুরা ভালোবেসে তাঁকে "রবি" বলে ডাকতেন, তাঁরা সম্বোধনের ক্ষেত্রে পদবি ব্যবহার করতেন না। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে তাঁকে "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" নামে সম্বোধন করা হত। কিন্তু আমরা চীনারা তাঁকে সাধারণত "ঠাকুর" নামে সম্বোধন করে থাকি। তবে, পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে "ঠাকুর" পদবির বহু মানুষ বসবাস করেন। সুতরাং যদি কবিকে শুধু "ঠাকুর: সম্বোধন করা হয়, বোঝা কঠিন হয় কাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ মে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে কবির বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ছিলেন তাঁর বাবামায়ের চতুর্দশ সন্তান, তাঁদের প্রথম কন্যাসন্তান শিশুকালেই মারা যান, কবির জন্মের পরে তাঁদের আরও একজন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনিও জন্মের পরপরই মারা যান। ফলত তাঁদের ৮ জন পুত্র এবং ৫ জন কন্যা সন্তান জীবিত ছিলেন।

১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর, কবি মাত্র ২২ বছর বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তার স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর বয়স তখন ১০ বছরের কম ছিল (তিনি ১৮৭৪ সালের ১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন)। মৃণালিনী দেবীর ১৪ বছর বয়সে তাঁদের প্রথম কন্যাসন্তান (বেলা) জন্ম গ্রহণ করেন। এরপর ১৬ বছর বয়সে তাঁর প্রথম পুত্রসন্তান রথীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়সে তাঁর দ্বিতীয় কন্যা রেণুকা (১৮৯১ সালের জানুয়ারিতে) জন্মগ্রহণ করেন। ২১ বছর বয়সে তৃতীয় কন্যা মীরা দেবী (১৮৯৪ সালের ৩ জানুয়ারি) এবং ২৩ বছর বয়সে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ (১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর) জন্মগ্রহণ করেন।

১. পারিবারিক পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহৎ চরিত্র গঠন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার একটি শিক্ষিত সাহিত্যপ্রীত, বিশাল ধনী জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ছিলেন ঠাকুর-পরিবারের ব্যবসায়িক সাফল্যের পথিকৃৎ। তিনিই প্রথম ব্যবসা শুরু করে বিপুল অর্থ সম্পদ অর্জন করেন, যা তাদের পরিবারকে কলকাতার অন্যতম ধনী ও প্রভাবশালী পরিবারে পরিণত করে। এরপর তিনি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে কিছু জমি কিনে বড় জমিদার হয়ে ওঠেন এবং কৃষি জমি লিজ্ দিতে থাকেন।

তবে, দ্বারকানাথ ঠাকুর কোনো অহংকারী, প্রতারক বা নিষ্ঠুর জমিদার ছিলেন না, তিনি দরিদ্র কৃষকদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করেন নি। বরং তিনি ছিলেন একজন সমাজকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ দানশীল ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিশীল জমিদার। ইতিহাসের ঘাঁটলে জানা যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর কলকাতা গ্রন্থাগার নির্মাণে বিপুল অর্থ দান করেছিলেন এবং ভারতের আধুনিক উচ্চশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য উদারভাবে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানই হলো "হিন্দু কলেজ", যা পরে বিশ্বের খ্যাতনামা "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে" পরিণত হয়। ১৮২০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ ভারতীয় কৃষি ও উদ্যানতত্ত্ব সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ দান করেছিলেন। ১৮৩০ সালে তিনি কলকাতা চ্যারিটেবল সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য বিনিয়োগ করেন। ১৮৩১ সালে হিন্দু চ্যারিটেবল সমিতি প্রতিষ্ঠার সময়ও তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করেছিলেন। ১৮৩৫ সালে তিনি কলকাতার প্রথম মেডিকেল কলেজ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর সমাজের কল্যাণমূলক কাজে কত পরিমাণ অর্থ দান করেছিলেন, তা নির্ধারণ করা কার্যত অসম্ভব। তার এই মহান দানশীল মনোভাব এবং উদারভাবে জনহিতকর কাজে অর্থ ব্যয় করার মানসিকতা তার পরবর্তী প্রজন্মের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রভাব তার ছোট নাতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনেও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।

১৮৪৬ সালের ১লা আগস্ট, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংল্যান্ডে থাকাকালীন আশ্চর্যজনকভাবে পরলোক গমন করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে ঠাকুর পরিবারে নেমে আসে গভীর সংকট। পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) কাঁধে তুলে নেন পারিবারিক সম্পত্তি পুনরুজ্জীবিত করার কঠিন দায়িত্ব। তার পেছনে ছিলেন আরও দুই ছোট ভাই, যাদের দেখাশোনার ভারও ছিল তাঁর ওপর। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেন যে, ঠাকুর পরিবারের কোম্পানি ঋণের ভারে প্রায় ডুবে গেছে। ঋণদাতারা দলে দলে তার দরজায় এসে দাঁড়ালেন পাওনা আদায়ের জন্য। তখন দেবেন্দ্রনাথ তাদের নিজের বাসভবনে আমন্ত্রণ জানিয়ে, অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বললেন, আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির পরিবারের শেয়ার বাজেয়াপ্ত করার অধিকার ঋণদাতাদের নেই। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, যতদিন তাঁর পিতার ঋণ পরিশোধ না হচ্ছে, ততদিন তিনি এবং তাঁর ভাইয়েরা কোম্পানি থেকে এক পয়সাও গ্রহণ করবেন না। তাঁর এই আন্তরিক বক্তব্য ঋণদাতাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তাঁর সততা এবং আত্মবিশ্বাস তাদের আস্থা অর্জন করে। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন একনিষ্ঠ

দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং লন্ডনের কেনসাল গ্রিন সিমেট্রিতে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ

এবং প্রতিভাবান এক ব্যবস্থাপক। কয়েক বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি সমস্ত ঋণ শোধ করতে সক্ষম হন এবং ঠাকুর কোম্পানি পুনরায় অতীতের গৌরব ফিরে পায়।

"কথা দিয়ে কথার দাম রাখা" ছিল ঠাকুর পরিবার ব্যবসার মূল নীতি। পরিবারের প্রবীণদের মহৎ চরিত্র শুধু তাদের ব্যবসার সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করেনি, বরং পরবর্তী প্রজন্মের অনন্য গুণাবলিরও পথপ্রদর্শক হয়েছিল। সেসময় ঠাকুর পরিবার ছিল এক বৃহৎ যৌথ পরিবার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতা-মাতার কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তাঁর সাতজন দাদা, পাঁচজন দিদি, এবং তাঁদের স্ত্রী, স্বামী, ভাগ্নে, ভাগ্নিরা সবাই একসঙ্গে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসবাস করতেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের সদস্যরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং প্রতিভাবান ছিলেন। তাঁরা সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। কবির বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ছিলেন এক জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিত, সাহিত্যানুরাগী কবি, এবং গণিতপ্রেমী দার্শনিক। তিনি বহু সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং

রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান রেকর্ড করার জন্য স্বরলিপি রচনার অন্যতম অগ্রপথিক ছিলেন। তাঁর মেজো দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) ঠাকুর পরিবারের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনিক পরিষেবায় প্রথম বাঙালি কর্মচারী। তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। কবির জ্যোতিদাদা অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) ছিলেন একজন বহুমুখী প্রতিভাবান শিল্পী। তিনি একাধিক বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি পিয়ানো, বেহালা, গিটার বাজাতে পারতেন, সুর সৃষ্টি করতে পারতেন, কবিতা লিখতেন এবং অভিনয়ও করতেন। ঠাকুর পরিবারের মেয়েরাও সাহিত্যের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। কবির সেজদিদি স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) ছিলেন একজন মহিলা সাহিত্যিক, যিনি একাধিক উপন্যাস, নাটক এবং কাব্যগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। তিনি "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদিকাও ছিলেন। কবির ছোট দিদি বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৯-১৯৪৩) ছিলেন একজন অসাধারণ মেধাবী এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধপ্রাণা।

এমন গভীর সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রে স্বভাবতই পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি ঠাকুর পরিবারের মহৎ চরিত্র ও উত্তম ঐতিহ্যকে ধারাবাহিকভাবে ধারণ করে সেই যুগের একজন অসাধারণ গুণাবলিসম্পন্ন মহান কবি হয়ে ওঠেন। তিনি শুধু প্রায় ১ লক্ষেরও বেশি কবিতা, ৮০টিরও বেশি নাটক, ৯৬টি ছোটগল্প, ১৫টি উপন্যাস, অসংখ্য প্রবন্ধ এবং ১৯ খণ্ডের পত্র সংকলন রচনা করেন, উপরন্তু তাঁর মহৎ চরিত্রের মাধ্যমে তিনি এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। বাংলার মানুষ তাকে শ্রদ্ধাভরে "গুরুদেব" বলে সম্বোধন করেন, যার অর্থ "কবিসম্রাট" এবং "শিক্ষাগুরু"।

২. বিশ্বপ্রেম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহৎ চরিত্রের একটি অন্যতম উজ্জ্বল দিক

চীনে একটি প্রবাদ আছে, যা হলো—"Hou De Zai Wu" (厚德载物), এই প্রবাদ চীনের প্রাচীন গ্রন্থ "Book of Changes" 《易经-坤卦》-এ উল্লিখিত আছে। এর মূল অর্থ হলো—পৃথিবীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, যে মানবজাতি ও প্রাণীকুলকে লালন-পালন করে চলেছেন। বর্তমানে এটির বৃহত্তর অর্থ ব্যবহৃত হয়, যা সাধারণত বিশাল দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্য, নৈতিকভাবে মহৎ ব্যক্তিদের নির্দেশ করে। এটি মহৎ এবং নৈতিক গুণাবলীর মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত কিছু ধারণকারী গুণী মানুষের প্রতীক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। আমার মনে হয়, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্বকে বর্ণনা করতে "হৌ দে" (厚德) অর্থাৎ "মহৎ" শব্দটি ব্যবহার করা যথাযথ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মহৎ" ব্যক্তিত্ব প্রথমত তাঁর উদার মনোভাব এবং অফুরন্ত ভালোবাসাকে প্রকাশ হয়। "বিশ্বপ্রেম" হলো কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্বের মূল আধার। কবির জীবনে বিশ্বপ্রেমের দুটি দিক স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথমত, তিনি তাঁর স্ত্রীকে গভীর ভালোবাসা দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন এবং সন্তানদের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ও মমত্ব ছিল অতুলনীয়। দ্বিতীয়ত, তিনি দরিদ্র কৃষকদের প্রতি অসীম সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন এবং তাদের কল্যাণে সদা উদ্যোগী ছিলেন।

ক. স্ত্রীর প্রতি যথাযোগ্য ভালবাসা এবং সন্তানদের প্রতি স্নেহ

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২ বছর বয়সে বিবাহ করেন, তখন তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর বয়স ছিল মাত্র ১০ বছরেরও কম। তাঁরা প্রেমের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হননি, বরং তাঁর সেজবৌদি এবং ছোটবৌদির গ্রামের বাড়িতে তাঁর জন্য উপযুক্ত কনে খুঁজে বের করলে

তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতাই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। আসলে, এটি ছিল চীনের পিতামাতার দ্বারা নির্ধারিত আনুষ্ঠানিক বিবাহের মতই। কলকাতা শহরের প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণদের চোখে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার ছিল "অপবিত্র" ব্রাহ্মণ, যাদেরকে বাংলায় বলা হয় "পিরালী ব্রাহ্মণ"। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষরা মুসলমান ও ইংরেজদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, ফলত তাঁরা তথাকথিত পবিত্র ব্রাহ্মণদের তালিকা থেকে বাদ পড়েছিলেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের লোকেরা "অপবিত্র" ব্রাহ্মণদের সাথে আত্মীয়তা করতে চাইতেন না। তাই ঠাকুর পরিবারের পুত্রসন্তানদের জন্য কনে খুঁজতে গেলে সমগোত্রীয় "পিরালী" ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যেই সন্ধান করতে হত।

আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম থেকে জানতে পারি যে, তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন প্রেম-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন এবং পিতামাতার দ্বারা নির্ধারিত আনুষ্ঠানিক বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন। বিশেষত, তিনি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী পিতামাতার হাতেই সন্তানের বিবাহ নির্ধারিত হত। কবি ছিলেন একজন আদর্শ সন্তান, পিতার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি মন থেকে একেবারেই প্রস্তুত না থাকলেও, পিতার আদেশ মেনে নিতে বাধ্য হন। বিয়ের আগে তিনি নিজের এক বন্ধুকে একটি আমন্ত্রণপত্র লিখেছিলেন:

> প্রিয় বাবু-
> আগামী রবিবার ২৪ অগ্রহায়ণ তারিখে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬ নং জোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন।
> ইতি-
> অনুগত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই আমন্ত্রণপত্রটি যিনি পড়েছেন, তার মনে হবে যেন কবি নিজে বিয়ে করছেন না, বরং তার "পরমাত্মীয়—মহামান্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" বিয়ে করছেন। এটি দেখতে হাস্যকর হলেও, এটি তরুণ কবির মানসিক অবস্থা প্রতিফলিত করে। তিনি নিজে এই বিবাহ নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই আমন্ত্রণপত্রটি প্রকৃতপক্ষে তার অন্তর্দাহ প্রকাশের একটি বিশেষ মাধ্যম ছিল।

বিয়ের অনুষ্ঠানে তাঁর আচরণ থেকেও বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর পিতার সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথাগত হিন্দু বিয়ের অনুষ্ঠানে একটি রীতির মধ্যে মাটির ভাঁড়ে চাল এবং ডাল ভর্তি করা হয়, কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত মাটির ভাঁড়গুলো উল্টে দিয়ে টেবিলের উপর রেখেছিলেন। বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করা ছোট কাকিমা ত্রিপুরাসুন্দরী তাঁকে অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ও কি করিস রবি? ভাঁড়গুলো সব উল্টেপাল্টে দিচ্ছিস কেন?"

রবি বলল, "কাকিমা, এখন সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে, তাই আমি এই মাটির পাত্রগুলোও উল্টো করে রেখে দিয়েছি।" এর থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি নিজের বিয়ে নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন, তবে প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহসও পাননি।

বিয়ের পর, তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী কঠোর পরিশ্রম করে লেখাপড়া শেখা শুরু করেন এবং শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর স্বামী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ জীবনসঙ্গিনী হয়ে ওঠেন। তিনি পরিবারের তরুণ প্রজন্মের প্রিয়জন এবং পুরো

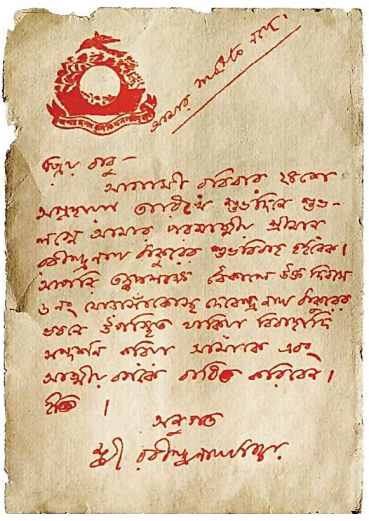

নিজের হাতের লেখা বিয়ের আমন্ত্রণপত্র এবং নববিবাহিতা স্ত্রীর সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিবারের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে ওঠেন। তাঁর গুণাবলী ও ভালোবাসা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃদয় জয় করে নেয়। ফলে তিনি কবির প্রকৃত প্রেয়সী হয়ে ওঠেন। তিনি কবিকে পাঁচটি সন্তান উপহার দেন—তিনটি মেয়ে এবং দুটি ছেলে। কবি তাঁর গুণবতী স্ত্রীকে প্রতি গভীর ভালোবাসার পাশাপাশি সন্তানদের প্রতিও পরম স্নেহশীল ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁর স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বহু চেষ্টা করেও চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁকে সুস্থ করা সম্ভব হয়নি। কবি দিনরাত তাঁর অসুস্থ স্ত্রীর পাশে থাকতেন, তপ্ত গ্রীষ্মের দিনে তিনি স্ত্রীর জন্য হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতেন। তবু, সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়, এবং মাত্র ২৮ বছর বয়সে মৃণালিনী দেবী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্ত্রীর মৃত্যু কবিকে গভীর শোকগ্রস্ত করে তোলে। তাঁর প্রতি প্রেম ও বিরহের অনুভূতি প্রকাশ করতে তিনি ২৭টি কবিতা লেখেন এবং সেই কবিতাগুলি নিয়ে *স্মরণ* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রতিটি কবিতায় স্ত্রীর প্রতি তার নিখুঁত প্রেম ও গভীর স্মৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। এক কবিতায় তিনি লিখেছেন :

তখন নিশীথরাত্রি; গেলে ঘর হতে
যে পথে চল নি কভু সে অজানা পথে।
যাবার বেলায় কোনো বলিলে না কথা,
লইয়া গেলে না কারো বিদায়বারতা।
সুপ্তিমগ্ন বিশ্ব-মাঝে বাহিরিলে একা–
অন্ধকারে খুঁজিলাম, না পেলাম দেখা।
মঙ্গলমুরতি সেই চিরপরিচিত
অগণ্য তারার মাঝে কোথায় অন্তর্হিত!
গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে?
এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে?
বিশ বৎসরের তব সুখদুঃখভার

ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার!
প্রতিদিবসের প্রেমে কতদিন ধরে
যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গল-করে
পরিপূর্ণ করি তারে স্নেহের সঞ্চয়ে,
আজ তুমি চলে গেলে কিছু নাহি লয়ে?
তোমার সংসার-মাঝে, হায়, তোমা-হীন
এখনো আসিবে কত সুদিন-দুর্দিন–
তখন এ শূন্য ঘরে চিরাভ্যাস-টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে?
আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে–
হে কল্যাণী, গেলে যদি, গেলে মোর আগে,
মোর লাগি কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যা-তরে?"
... ...
"ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে
তোমার করুণাপূর্ণ সুধাকণ্ঠস্বরে।
আজ তুমি বিশ্ব-মাঝে চলে গেলে যবে
বিশ্ব-মাঝে ডাকো মোরে সে করুণ রবে।
খুলি দিয়া গেলে তুমি যে গৃহদুয়ার
সে দ্বার রুধিতে কেহ কহিবে না আর।
বাহিরের রাজপথ দেখালে আমায়,
মনে রয়ে গেল তব নিঃশব্দ বিদায়।
আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।
নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক্ সিন্দূরের লেখা।
একান্তে বসিয়া আজি করিতেছি ধ্যান
সবার কল্যাণে হোক তোমার কল্যাণ।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স তখন মাত্র ৪০-এর কিছু বেশি। স্ত্রী মৃণালিনীর মৃত্যু তাঁকে গভীর শোকে ডুবিয়ে দিলেও সন্তানদের কথা চিন্তা করে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হননি। তিনি ভালো করেই জানতেন, তৎকালীন ভারতীয় সমাজে সৎমায়ের দ্বারা পূর্বস্ত্রীর সন্তানদের প্রতি অত্যাচারের দৃষ্টান্ত উপস্থিত ছিল সর্বত্র। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর দ্বিতীয় কন্যা রেণুকা যক্ষ্মা রোগে (টিবি) আক্রান্ত হন। মেয়ের অসুস্থতায় তিনি ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং ডাক্তারদের শরণাপন্ন হন। ডাক্তারদের পরামর্শে, তিনি রেণুকাকে নিয়ে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে যান। কারণ ভালো পরিবেশে থাকার মাধ্যমে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু বেশ কয়েকদিন কাটলেও রেণুকার অবস্থার কোনো উন্নতি দেখা যায়নি। উপরন্তু অসুস্থতার কষ্টে রেণুকা সেখানে আর থাকতে চাইছিলেন না। তাই কবি ও তাঁর কর্মচারীরা রেণুকাকে খাটিয়ায় শুইয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড়ি দুর্গম পথ ধরে ৩-৪ কিলোমিটার হাঁটতে শুরু করেন। শেষে তাঁরা একটি স্টেশনে পৌঁছান, এবং সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু বেশিদিন সঙ্গ দিল না রেণুকা। তিনিও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। এই শোক কবির জন্য সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। তবুও তিনি নিজের অসহনীয় দুঃখকে জয় করে সৃষ্টির পথে অবিচল থাকলেন।

সাধারণ মানুষও আপন স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা দেখায়। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা ছিল অত্যন্ত গভীর এবং অনন্য। ৪০ বছর বয়সী একলা পুরুষ, যিনি শুধুমাত্র সন্তানদের সৎমায়ের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি। এ ছিল সেই যুগের ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে একেবারেই বিরল ঘটনা। কিন্তু কবি রবিঠাকুর সেটাই করে দেখিয়েছিলেন।

খ. দরিদ্র কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, সহায়তা প্রদান এবং বিপদগ্রস্ত বর্গাচাষীদের জমির খাজনা মকুব

১৮৮৯ সালের ২৫ নভেম্বর, মাত্র ২৮ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার আদেশে, স্ত্রী মৃণালিনী, কন্যা বেলা এবং পুত্র রথীন্দ্রনাথসহ অন্যদের নিয়ে কলকাতার বৃহত্তর শহর ছেড়ে বৃহত্তর বাংলার উত্তরাঞ্চলের গ্রামে পৈতৃক জমিজমা পরিচালনার জন্য যান। ঠাকুর পরিবারের দশটিরও বেশি জমিদারি পরগণা ছিল, যা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, পাবনা, রাজশাহী জেলা এবং উড়িষ্যার কিছু অঞ্চলে ছিল। তবে জমির মূল প্রশাসন শিলাইদহে ছিল, সেজন্য তিনি পরিবারসহ শিলাইদহে বসবাস শুরু করে। ১৮৮৯ সালের নভেম্বরের শেষ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার গ্রামাঞ্চলে প্রায় দশ বছর বসবাস করেন। এই সময়কালে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন বাংলার কৃষকদের দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা এবং তাদের দৈনন্দিন কষ্ট ও শোষণের বাস্তবতা।

কোনো একবছর গ্রীষ্মকালে, তাঁর পরিচালিত জমিদারি এলাকায় অবিরাম বৃষ্টি পড়তে থাকে, নদীর বাঁধ ভেঙে যায় এবং ফলে ধানের জমি বন্যায় ডুবে যায়। সে বছর ফসলের ফলন প্রায় অর্ধেক কমে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছিল, এবং চাষীরা নিঃসন্দেহে হতাশ হয়ে পরেছিল। এই শোকাবহ পরিস্থিতি দেখে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ তিনি ভাবতে থাকেন কৃষকদের জমির খাজনা কমানো উচিত, কিন্তু এতে ঠাকুর পরিবারের আয় কমে যাবে। তখন ঠাকুর পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না, পরিবারটির অনেকগুলি সদস্য ছিল এবং তাদের মূল উপার্জন ছিল জমির খাজনা থেকে। তবুও, তিনি বারংবার চিন্তা করে দেখলেন, কৃষকদের ওই বছরের জমি খাজনা মকুব করা দরকার। যদিও পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি সুবিধাজনক ছিল না, তবে তাঁদের খাবারের অভাব ছিল না, এবং তাই তিনি কলকাতা ফিরে এসে পিতাকে তার ভাবনাচিন্তা জানাতে চাইলেন।

পিতা পুত্রের পরামর্শ শুনে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর শান্ত গলায় বললেন, "তোমার ধারণাটা ভাল, চাষীদের বর্তমান সত্যিই দুঃখজনক, আমরা আর তারা সবাই মানুষ, তাদের দুঃখের কথা আমাদের ভাবা উচিত। তবে এক বছরের জন্য ১০ লাখ টাকা মকুব করা বড় অংকের টাকা।" "তাহলে এখন উপায়?" রবীন্দ্রনাথ দুশ্চিন্তায় বললেন, "আমাদের চাষীদের দুর্দশা দেখতে আমি একেবারেই সহ্য করতে পারছি না।" পিতা তাকে বললেন, পরিবারের অন্য সদস্যদেরও রাজি করাতে হবে, তাদেরও এই প্রস্তাবে সহমত দরকার।

পিতার সমর্থন পাওয়ার পর, কবি পরিবারের সদস্যদের একে একে বোঝাতে শুরু করেন। তিনি গ্রামের বন্যা পরিস্থিতি এবং চাষিদের দুর্দশার কথা পরিষ্কারভাবে সবার সামনে তুলে ধরেন। একে একে তিনি বেশ কয়েকজনের সমর্থন আদায় করেন। এরপর একটি পারিবারিক সভা আয়োজন করা হয়। সভায় তিনি প্রথমেই নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করেন—তিনি নিজে তাঁর জমির খাজনার অংশ ছেড়ে দেওয়ার

জমিদারি পরিচালনাকালে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের গ্রামবাসীদের সাথে সরাসরি কথা বলতেন যেভাবে

সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এই দৃঢ় উদ্যোগ এবং ত্যাগের মনোভাব তাঁর প্রস্তাবের প্রতি পরিবারের সদস্যদের সমর্থন এনে দেয়।

পারিবারিক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সেই বছরের জমির খাজনার অর্ধেক, প্রায় ১০ লাখ টাকা, মকুব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই উদার সিদ্ধান্ত চাষিদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। তারা কবি রবীন্দ্রনাথের মহানুভব হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে এই তরুণ "জমিদার সাহেব"-এর প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে।

জমিদারি পরিচালনার দশ বছরে তিনি কৃষকদের জন্য সাতটি কল্যাণকর কাজ করেছিলেন। ভূমি পরিদর্শনের সময়, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লক্ষ্য করেছিলেন, পরিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে গ্রামে প্রায়ই মহামারী দেখা দেয়। রাস্তাঘাট দীর্ঘদিন মেরামতির অভাবে যাতায়াতের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। গ্রামে কোনো বিদ্যালয় ছিল না, ফলে শিশুরা পড়াশোনা করতে পারত না। তিনি উপলব্ধি করলেন, উপরিউক্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে চাইলে একটি সংগঠন প্রয়োজন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তার ব্যবস্থাপিত জমিদারির এলাকায় একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করবেন, যার নাম দিলেন "হিতৈষী সভা"। তিনি প্রথমে রাজশাহী জেলার কালিগ্রাম এলাকায় এই হিতৈষী সভা গঠন করেন। তিনি কালিগ্রাম এলাকাটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন, এবং প্রতিটি ভাগের প্রতিটি গ্রামের বাসিন্দারা তাদের মধ্যে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে—"জ্ঞানী"—নির্বাচন করতেন। এই জ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত হয় প্রত্যেক ভাগের হিতৈষী সভা। এরপর তিনটি ভাগের জ্ঞানীদের মধ্যে থেকে পাঁচজন সর্বাধিক গুণী জ্ঞানী নির্বাচন করা হয়, যারা কালিগ্রাম এলাকার প্রধান "হিতৈষী সভা" গঠন করেন। এই পাঁচজনকে সবাই "পঞ্চজ্ঞানী" বলে সম্বোধন করতেন। এই "পঞ্চজ্ঞানী" ছাড়াও, কালিগ্রাম এলাকার "হিতৈষী সভা"-য় একজন জমিদারের প্রতিনিধিও অংশগ্রহণ করতেন।

"হিতৈষী সভা"-র কাজ পরিচালনার জন্য তিনি কৃষকদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন, সকলের কাছে নামমাত্র সদস্য ফি জমা নেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ঠিক করা হয় যে, কৃষকেরা জমির খাজনা পরিশোধ করার সময়, প্রতি এক রুপি খাজনার সঙ্গে অতিরিক্ত ৩ পয়সা জমা দেবেন (১ রুপি = ১০০ পয়সা)। এই সদস্য ফি আলাদা একটি অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে, যা শুধুমাত্র কল্যাণ সমিতির জন্য ব্যবহৃত হবে। ওই অঞ্চলের সমস্ত কাজ তিনটি উপ-অঞ্চল "হিতৈষী সভা"-র

মাধ্যমে পরিচালিত হতো। প্রাপ্ত অর্থ সমান তিন ভাগে ভাগ করে এই তিনটি উপ-অঞ্চল হিতৈষী সভায় হস্তান্তর করা হতো।

সাধারণত, প্রধান "হিতৈষী সভা" প্রতি বছর একটি বার্ষিক সভা আয়োজন করত। এই সভার প্রধান কাজ ছিল গতবছরের হিসাব পরীক্ষা করা এবং আগামীবছরের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা। নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে বাজেট অনুমোদন করা হতো। এই দুটি ছিল বার্ষিক সভার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এছাড়াও, জমিদারি পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কোনো দোষ বা অপরাধ রয়েছে কি না, যেমন কৃষকদের ওপর অবিচার বা শোষণ ঘটেছে কি না, তাও আলোচনা করা হতো। এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে, তা জমিদার মহাশয়ের প্রতিনিধির কাছে রিপোর্ট করা হতো।

প্রতি বছর "হিতৈষী সভা" প্রায় ৫০০০-৬০০০ রুপি সদস্য ফি আয় করত। ভূমিহীন কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিদ্ধান্ত নেন তাঁর নিজস্ব জমিদারির থেকে আরও ২০০০ রুপি প্রদান করবেন এবং সেটি "হিতৈষী সভা"-র তহবিলে জমা করবেন। কৃষকরা এই অর্থকে "সাধারণ তহবিল" বা "পুঞ্জীভূত তহবিল" নামে ডাকা শুরু করেন। পরে হিতৈষী সভার সদস্য ফি-এর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। অর্থ থাকায়, সমস্যার সমাধান করাও সহজ হয়ে ওঠে।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমেই গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পুরো এলাকায় এর আগে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। ধনী পরিবারের সদস্যরা তাদের সন্তানদের শিক্ষালাভের জন্য শহরের স্কুলে পাঠাতেন। কিন্তু গরীব পরিবারের শিশুরা শহরে গিয়ে পড়ার কোনো সুযোগ পেত না। হিতৈষী সভার সিংহভাগ তহবিল শিক্ষার উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে, হিতৈষী সভা এলাকার প্রতিটি গ্রামে একটি পাঠশালা বা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। সেইসঙ্গে, প্রতিটি ভাগে একটি করে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছিল। পতিসর গ্রামে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করা হয়েছিল। বিদ্যালয়ের ভবন ও ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। এ কারণে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব নেন। কারণ হিতৈষী সভার তহবিল দিয়ে এত বিশাল ব্যয়ের জোগান দেওয়া সম্ভব ছিল না। এভাবে বিদ্যালয়ের ভবন ও ছাত্রাবাস নির্মাণের পর, গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারের শিশুরাও পড়াশোনার সুযোগ পায়।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছিলেন, তা হলো গ্রামীণ হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা পরিষেবার অত্যন্ত অভাব ছিল। কালিগ্রামের মতো এলাকায় একজন প্রকৃত চিকিৎসক বা দক্ষ ডাক্তার পাওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। গ্রামের মানুষের চিকিৎসার সুবিধার জন্য হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা, ছিল অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ এবং এটি সাধারণ মানুষের প্রধান দাবি ছিল। এই প্রয়োজন বুঝে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "হিতৈষী সভা"-এর সাহায্যে পতিসর গ্রামে একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। পরবর্তীতে আরও দুটি অঞ্চলে চিকিৎসকসহ দুটি চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় উদ্যোগ ছিল সড়ক ও জেটি নির্মাণ। কালিগ্রাম এলাকার বেশিরভাগ জমি অনুর্বর এবং ঝোপঝাড়পূর্ণ। সেসময় গ্রামের আশেপাশে কোনো পাকা সড়ক ছিল না। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে মানুষ ধানজমির আল ধরে যাতায়াত করত। বর্ষাকালে জমিগুলো প্রায়ই বন্যায় ডুবে যেত, তখন মানুষকে নৌকায় যাতায়াত করতে হতো। যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অসুবিধাজনক ছিল। এজন্য "হিতৈষী সভা" সিদ্ধান্ত নেয়, সঞ্চয় তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি সড়ক নির্মাণ শুরু করা হবে। এর মধ্যে একটি ছিল পতিসর থেকে আত্রাই রেলস্টেশন পর্যন্ত, যার দৈর্ঘ্য ছিল ৭ মাইল। এই প্রধান সড়কটির নির্মাণ খরচ ঠাকুর এস্টেট থেকে বরাদ্দ করা হয়। এই রাস্তা তৈরি হওয়ার পর মানুষের যাতায়াত অনেক সহজ হয়ে যায়।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রবর্তন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে হলে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে, আর উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য কৃষি প্রযুক্তি প্রবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পশ্চিমের অনেক দেশে সফর করেছিলেন এবং তিনি জানতেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় পশ্চিমের দেশগুলিতে কৃষিক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি হয়েছে। তাই তিনি মনে করেছিলেন, ভারতের ক্ষেত্রেও কৃষি প্রযুক্তি প্রবর্তন জরুরি। এই উদ্দেশ্যে, ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ নিজ খরচে তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথ এবং তাঁর বন্ধুর ছেলেকে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য পাঠান।

রথীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে এলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শিলাইদহ গিয়ে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি পুনর্জাগরণের কাজে যুক্ত হতে বললেন। তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন: "আমি এখানে আরও কিছু উন্নতি করতে চাই, কিন্তু এখন আর আমি নিজে তা করতে পারছি না। সুতরাং তোমাকেই তা করতে হবে, বিশেষ করে কৃষি উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে।"

পিতার নির্দেশ অনুযায়ী, রথীন্দ্রনাথ কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিলাইদহের কার্যালয়ের নিকটবর্তী কয়েকটি জমি তিনি পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচিত করেন এবং সেখানেই ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন পরীক্ষা শুরু করেন। শিলাইদহ এলাকার মাটিতে কোন কোন খাদ্যশস্য চাষ করা সম্ভব, তা বোঝার জন্য তিনি একটি ছোট ল্যাবরেটরি স্থাপন করেন। সেখানে মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে মাটির ধরন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা শুরু করলেন। এর ফলে ওই অঞ্চলে ধানসহ বিভিন্ন খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আসলে, ওই এলাকায় ধান ছাড়া কৃষকেরা অন্য কোনো ফসল চাষ করতেন না। রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ভুট্টার বীজ নিয়ে এলেন এবং কৃষকদের ভুট্টা চাষ শেখালেন। পাশাপাশি তিনি তাদের আলু, টমেটো, আখ এবং অন্যান্য অর্থকরী ফসল চাষ করতেও উৎসাহিত করলেন। কৃষকেরা ধীরে ধীরে এসব নতুন ফসল চাষ করা শিখলেন। ফলে আলু, আখ, টমেটো এবং ভুট্টার মতো ফসল বাংলার এই অঞ্চলে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ছিল গ্রামীণ হস্তশিল্পের উন্নয়ন। বাংলাদেশের কৃষকেরা বছরের বেশ কয়েক মাস কর্মহীন অবস্থায় বসে থাকতেন। কবি মনে করেছিলেন, এই অবসর সময়টাতে তাঁরা কিছু হস্তশিল্পের কাজ করতে পারেন, যা পরিবারের ব্যয়ভার বহনে সহায়ক হতে পারে। তাই তিনি কৃষকদের

পারিবারিক হস্তশিল্পের বিকাশে উৎসাহিত করেছিলেন। কালিগ্রাম এলাকায় তেমন কোনো উন্নত তাঁতশিল্প কেন্দ্র ছিল না। সেখানে কেবলমাত্র কয়েকটি মুসলিম পরিবার সাধারণ তাঁতের কাজ করত, যাঁরা শুধুমাত্র মোটা গামছা বা অনুরূপ পণ্য তৈরি করতেন। এই পরিস্থিতি দেখে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে নির্দেশ দিয়েছিলেন গ্রামের একজনকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে তাঁত শেখানোর জন্য। এরপর, "হিতৈষী সভা"-র তহবিল থেকে অর্থ নিয়ে একটি তাঁত শিক্ষালয় স্থাপন করা হয়, যেখানে কৃষকদের তাঁতের কাজ শেখানো হতো এবং গ্রামে ছোট তাঁত কারখানা গড়ে তোলার জন্য দক্ষ কর্মী তৈরি করা হতো। এভাবেই এই এলাকায় পারিবারিক হস্তশিল্প উন্নতি লাভ করেছিল এবং আজও এখানে অনেক পরিবারিক হস্ততাঁতশিল্প চালু রয়েছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পুত্রকে পাঠানো এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

> বোলপুরে একটা ধানভানা কল চলচে, সেই রকম একটা কল এখানে (পতিসরে) আনতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এখানকার চাষীদের কোন industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছু জন্মায় না। এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিসটাকে Cottage industry- রূপে গণ্য করা চলে কিনা। একবার খবর নিয়ে দেখিস ছোটখাট furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কিনা। আরেকটা জিনিস আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে। খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আনতে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায় পেরে ওঠে না; খোলা পেলে সুবিধা হয়।

এই চিঠি থেকে আমরা দেখতে পাই, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বদা চিন্তা করতেন কীভাবে কৃষকদের মধ্যে পারিবারিক হস্তশিল্পের উন্নয়ন ঘটানো যায়। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি গ্রামের বাসিন্দাদের কল্যাণ নিয়ে সদা চিন্তিত ছিলেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ষষ্ঠ উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।

গভীর অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের পরে কবি জানতে পারেন, এই অঞ্চলের বহু কৃষক উচ্চ সুদের ঋণের ভারে জর্জরিত এবং তাঁদের জীবনে এই ঋণমুক্তির কোনো উপায় নেই। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো একটি কার্যকর স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। এ উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকে আট শতাংশ সুদে কয়েক হাজার রুপি ধার নেন এবং ১৮৯৩ সালে পতিসর গ্রামে একটি কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধার নেওয়া অর্থ ছিল ব্যাংকের প্রাথমিক মূলধন। কৃষকদের কাছ থেকে ব্যাংক বারো শতাংশ সুদ নিত। তবে প্রাথমিক মূলধন সীমিত থাকায় ব্যাংক সব কৃষকের ঋণের চাহিদা মেটাতে পারত না। এই সমস্যায় যখন রবীন্দ্রনাথ চিন্তিত ছিলেন, তখন আকস্মিকভাবে একটি সুযোগ আসে—তিনি ১,০৮,০০০ রুপির নোবেল পুরস্কার পান। পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে তিনি এই পুরস্কারের অর্থ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নামে কৃষি ব্যাংকে আমানত রাখেন। এতে উভয়পক্ষই লাভবান হয়। শান্তিনিকেতন (যা পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হয়) প্রতি বছর এই অর্থ থেকে ৮,০০০ রুপি সুদ পেতে থাকে। এই নতুন মূলধনের ফলে কৃষি ব্যাংক কৃষকদের ঋণ প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। কৃষি ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর, বহু কৃষক মহাজনী শোষণ থেকে মুক্তি পান। কিন্তু পরে, যখন ভারত সরকার "ঋণ মকুব আইন" (Debt Relief Act) প্রণয়ন করে, তখন কৃষি ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কৃষকদের ধার দেওয়া অর্থও আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বহু বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পরিবারের জমিদারি অঞ্চলের কৃষকদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধন করেছিলেন। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল, ভুট্টা, আলু, আখসহ অন্যান্য ফসলের চাষও শুরু হয়েছিল। গ্রামের সড়ক ও ঘাটের মেরামতির কাজ শুরু হয়েছিল এবং কয়েকটি কূপ খনন করা হয়েছিল, যা গ্রামের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেছিল। গ্রামীণ পারিবারিক তাঁতশিল্পও গড়ে উঠেছিল এবং গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। তিনটি আলাদা অঞ্চলে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল, এবং পতিসর গ্রামে একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পাশাপাশি, একটি কৃষি ব্যাংকও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উদ্যোগগুলির ফলে গ্রামের আর্থসামাজিক অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন হয়েছিল।

এই অধ্যায়ের সপ্তম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জলে ডুবে যাওয়া এক মহিলাকে উদ্ধার করেছিলেন।

গ্রামবাংলার দশ বছরের কর্মকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে—তিনি শুধু দরিদ্র কৃষকদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং তাদের সাহায্যের চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি একবার এক প্রায় ডুবে যাওয়া মহিলাকেও বাঁচিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা *আমার বাবা—রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে এই উদ্ধারকাণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন। আগ্রহী পাঠকরা এই বইটি পড়তে পারেন। এই ডুবে যাওয়া মহিলাকে উদ্ধারের ঘটনাটি আমাদের আবারও উপলব্ধি করায়, কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন জীবনপ্রেমী এবং মানবদরদী মানুষ।

তাঁর এই মানবদরদী মনের সাক্ষী হিসেবে আরেকটি ঘটনা রয়েছে, যা একজন বন্ধু ও তাঁর পরিবারের দুর্দশার প্রতি সহায়তার উজ্জ্বল উদাহরণ। এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহত্ত্ব এবং মানবতার এক জীবন্ত নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কূলচন্দ্র দে, যিনি একজন পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। তার পরিবার ঢাকার শহরতলির আড়িয়াল (শ্রীধরখোলা) এলাকায় বাস করত। তিনি এবং তার স্ত্রী ছয়টি সন্তানের জনক-জননী ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, কূলচন্দ্র দে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান এবং তাদের পুরো পরিবার চরম সংকটে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ঘটনা জানতে পেরেই তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেন। তিনি তাদের সাতজনকেই শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন এবং তাদের সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের সমস্ত ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্ধুর সন্তানদের নিজের সন্তানদের মতো করে লালনপালন করেছিলেন। তারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর তাদের নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ করে দেন। এই পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুলচন্দ্র (১৮৯৫–১৯৮৯) এবং দ্বিতীয় কন্যা রানি (১৯১২–১৯৯৭) ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুপারিশে রানি তাঁর ব্যক্তিগত সচিব অনিলকুমার চন্দের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন সায়াহ্নে, রানি ও তার স্বামী ঠিক তাঁর নিজের কন্যা এবং জামাতার মতো তাঁর পাশে ছিলেন।

৩. কবি রবীন্দ্রনাথের মহৎ ব্যক্তিত্বের মূল আধারই ছিল মর্যাদা এবং সম্ভ্রম

কবি রবীন্দ্রনাথ এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে ন্যায়বোধ ও সততার মূল্যবোধ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিক এই পরিবেশে বেড়ে ওঠার

কারণে, তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় যা তাঁর ন্যায়পরায়ণ ও স্পষ্টভাষী চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, পৃথিবীর সকল অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ এবং ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো তাঁর মহৎ ও ন্যায়পরায়ণ চরিত্রেরই উদাহরণ দেয়। এখন আমি তাঁর জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরব।

চীনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের আফিম বাণিজ্যের তীব্র নিন্দা

১৮৪০ সালের আফিমের যুদ্ধ মাঞ্চু চিং রাজত্বের পরাজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়। যুদ্ধের পর পরাজিত চিং সাম্রাজ্যকে শুধু জমি ও অর্থ দিতে বাধ্য করা হয়নি, ব্রিটিশরা বরং চীনে আরও বেশি পরিমাণে আফিম রপ্তানি বাড়িয়ে দেয়। তারা ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার উপনিবেশগুলোতে ব্যাপকভাবে পপি চাষ করে আফিম উৎপাদন করত এবং জোরপূর্বক চীনে আফিম সরবরাহ করে অবৈধ মুনাফা অর্জন করতে থাকে যা চীনা মানুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে। এই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী হন তরুণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাত্র ২০ বছর বয়সে, ১৮৮১ সালে, তিনি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে "ভারতী" পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লেখেন যার শিরোনাম ছিল 'চিনে মরণের ব্যবসা'। এই প্রবন্ধে তিনি ক্রোধে ফেটে পড়ে লেখেন:

> একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বলপূর্বক বিষপান করানো হইল; এমনতরো নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুনা যায় নাই। এশিয়ার একটি বৃহত্তম, প্রাচীন সভ্যদেশের বক্ষঃস্থলে বসিয়া বিষ কীটের ন্যায় তাহার শরীরের ও মনের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে তিল তিল করিয়া মরণের রস সঞ্চারিত করিতেছেন। ইহা আর কিছু নয়, একটি সবল জাতি দুর্বলতর জাতির নিকটে মরণ বিক্রয় করিয়া ধ্বংস বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু করিয়া লাভ করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের এই অমানবিক ও পাপপূর্ণ কার্যকলাপকে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন, একদম স্পষ্টভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আফিম বাণিজ্যের মাধ্যমে কিভাবে মানুষের ক্ষতি করেছে তার প্রকৃত প্রকৃতি প্রকাশ করেছিলেন, তীব্রভাবে নিন্দা করেছিলেন ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের নিষ্ঠুরতা এবং নির্মমতাকে, সঙ্গে জানিয়ে ছিলেন চীনা জনগণের প্রতি তার অগাধ মমতা ও গভীর সহানুভূতি।

জাপানি সামরিকতন্ত্রের সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনবার জাপান সফর করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে জাপানি জাতি "সৌন্দর্যপ্রেমী", "অতিথিপরায়ণ" এবং "সংযমী ধৈর্যের অধিকারী"। একসময় তিনি জাপানকে প্রাচ্যের আশা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি আবিষ্কার করেন যে, প্রাচ্যের এই দেশও "পাশ্চাত্য সভ্যতা"র সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে "প্রাচ্য সভ্যতা"র আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমবারের মতো জাপান সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। টোকিও পৌঁছানোর পর, জাপানি সরকার সেখানে তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায়। তাঁকে "প্রাচ্যের মহাকবি" এবং "জাপানের বন্ধু" হিসেবে সম্মানিত করা হয়। তবে পরে কবি বুঝতে পারেন যে, এই আন্তরিক অভ্যর্থনা কেবল সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য নয়, বরং এর পেছনে গূঢ় উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে। তিনি জানতে পারেন যে, জাপানি শাসকগণ ইতোমধ্যেই চীন দখলের একটি আগ্রাসী পরিকল্পনা করেছে—প্রথমে তাইওয়ান দখল, তারপর লিয়াওনিং প্রদেশ, জিলিন প্রদেশ, হেইলংজিয়াং প্রদেশএবং শেষে পুরো চীন। এই খবর পাওয়ার পর তিনি জাপানি শাসকদের কঠোর নিন্দা করতে শুরু করেন।

১৮৯৪-৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধের (জিয়া উ যুদ্ধ) সময় জাপান মাঞ্চুরিয়ান চিং রাজত্বকে পরাজিত করে তাইওয়ান, পেংহু দ্বীপসহ বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে। পরবর্তীতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং চিং তাও, জি নান রেলপথে সৈন্য প্রেরণ করে, শানডং প্রদেশে জার্মানির প্রভাবকে প্রতিস্থাপন করে। জাপানের এইসব আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাপান সফরের সময় নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে জাপানি সামরিকতন্ত্রের এই আগ্রাসন নীতির তীব্র নিন্দা করেছিলেন। পরে, তিনি "চীনা জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রতি সমর্থন" শীর্ষক এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

> তোমাদের এক প্রতিবেশী দেশ (জাপানকে উদ্দেশ্য করে) তোমাদের দান করা সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের উপহার থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে। নিজেদের মৌলিক স্বার্থে, তাদের উচিত ছিল তোমাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। কিন্তু তারা হঠাৎ পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা সাম্রাজ্যবাদী লোভের বিষাক্ত সংক্রমণ ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা প্রাচ্যের জন্য এক সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের সম্ভাবনাকে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে পরিণত করেছে।
>
> তারা শক্তি প্রদর্শনের নামে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে, শিক্ষা কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করছে, এবং মানবসভ্যতার সকল নীতিকে চরম অবজ্ঞা করে এশিয়ার আধুনিক মানসিকতাকে কলঙ্কিত করছে। অথচ এশিয়া আজকের এই যুগে সম্মানের আসন খুঁজে পেতে সংগ্রাম করে চলেছে।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি "স্পিরিট অব জাপান" নিয়ে শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। সেখানে জাপানের চীনের প্রতি মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তিনি স্পষ্টতই বলেন, পশ্চিমা

জাপানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রয়াত বন্ধু ওকাকুরার পরিবারের সঙ্গে, ১৯১৬

উপনিবেশবাদীদের মতো অন্য দেশের ভূমি লোভ করার প্রবণতা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর এই বক্তৃতা জাপানের উচ্চবিত্ত সমাজে মুহূর্তের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে এবং জাপান সরকারের প্রচণ্ড রোষের কারণ হয়। এর পরপরই তাঁর প্রতি শীতল উদাসীনতা এবং শত্রুতা দেখানো হয়, কিন্তু তিনি কোনোভাবেই দুর্বল হননি এবং জাপানের আগ্রাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমালোচনা চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত হননি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান সরকারের চাপের কারণে তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেননি। টোকিও ত্যাগ করার সময়, তাঁর বিদায় জানাতে কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না। যদিও পরিবেশ ছিল শীতল এবং নির্জন, কিন্তু তাঁর মনে এক ধরনের গোপন আনন্দ ছিল। জাপান থেকে আমেরিকা যাওয়ার পর, তিনি চীনের উপর জাপানের আগ্রাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে প্রকাশ্যে সমালোচনা চালিয়ে যান।

আমেরিকায় তিনি একাধিক বক্তৃতা প্রদান করেন এবং স্পষ্টভাবে বলেন:

> বর্তমানে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য হলো এক ধরনের শয়তানসুলভ স্বার্থপর অধিকারলিপ্সা। সমস্ত দেশের সামরিক প্রস্তুতি এবং কূটনীতি এই একমাত্র উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, প্রাচ্যেও জাপান এই পথেই পা বাড়িয়েছে।...
>
> জাপান কেবল পশ্চিমা দেশগুলির বাইরের বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করেনি, বরং তাদের লক্ষ্য এবং আদর্শকে নিজের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

"অন্যদের ক্ষতি করে নিজেকে সমৃদ্ধ করা" এটি এখন জাপানের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯২৪ সালের ১২ এপ্রিল থেকে ৩০ মে পর্যন্ত, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চীন সফরকালে জাপানের আগ্রাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে সমালোচনা অব্যাহত রাখেন। তিনি সাংহাইয়ে জাপানি অভিবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন:

> যখন আমি তোমাদের দেশে গিয়েছিলাম, আমি সেই পরিবর্তিত আধুনিক জাপানকে দেখেছি, যে জাপান পশ্চিমা ধাঁচ শিখেছে। আমি সেই সন্দেহপ্রবণ এবং মানবিক সংবেদনশীলতাহীন জাপানকেও দেখেছি যে শক্তিশালী রাজনীতি ব্যবহার করছে, নিজের স্বার্থ লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে, রাজনৈতিক শক্তি বাড়াচ্ছে, কঠোরভাবে বিদেশিদের দূরে সরিয়ে রাখছে।

তিনি জাপানের অভিবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

> তোমরা কখনও ভাবো না যে তোমরা অন্য জাতিগুলির ক্ষতি করছ। তারা তোমাদের অত্যাচার করেনি, অথচ তোমরা তোমাদের নিজ দেশের চারপাশে ঘৃণার বীজ বপন করছ, চেষ্টা করছ যেন এই বীজগুলি তোমাদের সুরক্ষার বেড়া হয়ে ওঠে।

এসমস্ত বক্তৃতা শান্তি এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁর ন্যায়পরায়ণ কণ্ঠস্বরকে প্রকাশ করে।

ব্রিটিশ গভর্নরের বাংলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ

১৯০৫ সালে, যখন লর্ড কার্জন উপনিবেশিক ভারতের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তিনি বাংলাকে বিভক্ত করার কথা ঘোষণা করেন। এই সিদ্ধান্তে ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সে সময় বাংলায় প্রায় ৭ কোটি ৮০ লাখ মানুষ বাস করতেন, যার মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় সমান। দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ এবং সংঘাত বাড়ার আশঙ্কা আগেই ছিল।

বাংলা বিভক্তির পর ভারতে দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অভূতপূর্ব সংঘাত এবং ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক আগেই ভারতবাসীদের এমন বিপদের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন এবং বলেছিলেন, উপনিবেশিক শাসকেরা ধর্মীয় বিরোধকে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনা উসকে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু তার এই সতর্কবার্তাকে তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর, বাংলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। সেই দিনটি বাংলার জনগণের জন্য "শোক দিবস" হয়ে ওঠে। ওই দিন সকালে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে রাস্তায় বিশাল মিছিলের আয়োজন করেন। মানুষ হাতে হাত ধরে একত্রিত হন এবং রবীন্দ্রনাথের রচিত বিশেষ একটি গান গাইতে থাকেন। বাংলার জনগণের তীব্র প্রতিবাদে গর্জে ওঠে রাস্তাগুলি। ঠাকুরের কলম থেকে সেদিন উদ্ভাসিত হয়েছিল দেশপ্রেমে ভরা গান, যা মিছিলের মানুষের কণ্ঠে প্রতিবাদ ও ঐক্যের সুর হয়ে উঠেছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ

১৯১৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, ব্রিটিশ শাসিত ভারতের আইনসভা একটি আইন পাশ করে, যা পুলিশকে অনুমতি দেয় যে কাউকে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার করতে এবং প্রকাশ্য বিচার ছাড়াই অনির্দিষ্টকাল কারারুদ্ধ রাখতে। এই আইন ভারতের মানুষের মধ্যে আবারও প্রচণ্ড অসন্তোষ এবং প্রতিবাদ তৈরি করে।

পাঞ্জাবে সবচেয়ে তীব্র প্রতিবাদ চলছিল। এই আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ শাসকরা নির্মম দমননীতি গ্রহণ করে। ১০ এপ্রিল ভোররাতে, পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে পুলিশ দুইজন রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এরপর প্রায় ৩০,০০০ নাগরিক শহর প্রশাসনের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তির দাবি জানায়। কিন্তু তাদের উপর পুলিশ ও অশ্বারোহী বাহিনী দমন চালায়। আন্দোলনকারীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং সেই রাতেই তারা রেলস্টেশন, টেলিগ্রাফ অফিস এবং টেলিফোন অফিস দখল করে। ইংরেজ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল রেক্স ডায়ার সেনাবাহিনী নিয়ে অমৃতসর শহরে প্রবেশ করেন এবং কারফিউ জারি করেন। ১৩ এপ্রিল প্রায় ৫০,০০০ জনতা জালিয়ানওয়ালাবাগ পার্কে জড়ো হয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। বিকেল ৪টার দিকে, ডায়ার ১৪৯ জন গুর্খা ও শিখ সেনা নিয়ে ওই পার্কে পৌঁছান। সূর্যাস্তের আগে, তিনি পার্কের সরু প্রবেশদ্বার ট্যাংক দিয়ে বন্ধ করে দেন এবং নিজে ১০০-এর বেশি সৈন্য নিয়ে পার্কে প্রবেশ করেন। সন্ধ্যা ৫টা ১৫ মিনিট নাগাদ, ডায়ার নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন, যা এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞে পরিণত হয়। ব্রিটিশ সরকারের তথ্যমতে, এই হত্যাকাণ্ডে ৩৭৯ জন নিহত এবং ১২০৮ জন আহত হয়। পার্কের একটি কুয়োতে অনেক মানুষ গুলি থেকে বাঁচার জন্য লাফিয়ে পড়ে ডুবে মারা যায়। পরে কুয়ো থেকে ১০০-র বেশি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ভারতীয় সূত্রে জানা যায়, মৃতের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। আহতদের অনেককেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও সময়মতো চিকিৎসা না পেয়ে তারা মারা যায়।

এই ঘটনায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মর্মাহত হন। তিনি এই মর্মান্তিক খবর শোনার পর শান্তি হারান এবং তৎক্ষণাৎ কলকাতায় ফিরে আসেন। তিনি বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে

যোগাযোগ করে একটি প্রতিবাদ সভা ডাকার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সেসময় কিছু রাজনৈতিক নেতা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংঘাতে যেতে চাননি, ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ ভারতের তৎকালীন গভর্নর লর্ড চেমসফোর্ডকে একটি চিঠি লিখে তিন বছর আগে ব্রিটিশ রানির পক্ষ থেকে প্রদত্ত "নাইটহুড" উপাধি ফিরিয়ে দেন। এই উপাধি ফিরিয়ে দিয়ে তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নৃশংসতার প্রতি তার তীব্র প্রতিবাদ জানান। চিঠিতে তিনি লেখেন:

> একটি শক্তিধর জাতি যখন নিরস্ত্র ও অসহায় মানুষের বিরুদ্ধে এইরকম নৃশংস পদ্ধতি ব্যবহার করে, তখন আমাদের দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে হবে যে, এটি কেবল রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য নয়, নৈতিক দিক থেকেও ক্ষমার অযোগ্য। আমি আমার দেশের জন্য এক ক্ষুদ্রতম কাজ যা করতে পারি, তা হলো আমার লক্ষ লক্ষ হতভম্ব স্বদেশবাসীর হয়ে প্রতিবাদ প্রকাশ করা। সময় এসে গেছে যখন সম্মানসূচক পুরস্কারগুলো অপমানের সঙ্গে মিশে গেছে যা আমাদের লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে। তাই আমি আমার সমস্ত বিশেষ সম্মান ত্যাগ করে আমার স্বদেশবাসীর পাশে দাঁড়াতে চাই। উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য আমি দুঃখিতভাবে অনুরোধ করছি, আমার নাইটহুড খেতাবটি বাতিল করা হোক।

অমৃতসর হত্যাকাণ্ড সেই সময়ে সমগ্র ভারতীয় জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এটি সমগ্র ভারতীয় জনগণের জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তোলে এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ফ্যাসিবাদী শাসক মুসোলিনির স্বৈরাচারী শাসনের নিন্দা

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ভ্রমণপ্রিয় একজন মানুষ। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ইতালির রাজার কাছ থেকে একটি আমন্ত্রণ পান এবং ১৫ মে জাহাজে চেপে নেপলসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নেপলসে পৌঁছে, তিনি শহরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা পান। এরপর মুসোলিনি নিজেই উপস্থিত হন এবং একটি বিশেষ গাড়িতে করে রবীন্দ্রনাথকে নেপলস থেকে রোমে নিয়ে যান এবং জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানান।

এই দ্বিচারী ফ্যাসিবাদী নেতা রবীন্দ্রনাথের ব্রিটিশ শাসনের নিন্দাসূচক বক্তব্যকে ব্যবহার করে ইতালির সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থাকে প্রশংসিত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে ব্যর্থ হন।

রবীন্দ্রনাথ যখন জনসাধারণের অভ্যর্থনা সভায় বক্তব্য দেন, তখন ইতালির রাজা তার প্রত্যাশিত কোনো প্রশংসামূলক বক্তব্য শুনতে পাননি। বরং রবীন্দ্রনাথ তার ভাষণে স্পষ্ট করে বলেন: "আমার চিন্তাধারা এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে কোনো মিল নেই; আমার আবেগের সঙ্গেও স্বৈরতন্ত্রের কোনো মিল নেই।"

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায়বিচারমূলক বক্তব্য ইতালির রাজার সমস্ত প্রত্যাশাকে ভেঙে দেয় এবং দুঃখের সঙ্গে তাকে সভাস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

জাপানি সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমনের নিন্দা এবং চীনা জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধে সমবেদনা ও সমর্থন প্রকাশ

১৯৩১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর জাপানি সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের উত্তর-পূর্ব অংশে আক্রমণ চালায় এবং ১৯৩৭ সালের ৭ জুলাই চীনের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু করে, যেখানে তারা চীনা জনগণের ওপর নির্মম গণহত্যা চালায়। এতে রবীন্দ্রনাথ বিভ্রান্ত

ও বেদনাবোধ করেন। কেন একটি দেশ, যাকে তিনি একসময় সভ্য বলে মনে করতেন, হঠাৎ একটি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর রাষ্ট্রে পরিণত হলো? কেন সেই দেশ, যাকে তিনি একসময় "এশিয়ার উদীয়মান সূর্য" বলে প্রশংসা করেছিলেন, পূর্বের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের উৎসে পরিণত হলো?

রবীন্দ্রনাথ জাপানের প্রতি হতাশ হয়ে পড়েন। ১৯৩৬ সালের ১২ এপ্রিল, কলকাতায় একটি আক্রমণ-বিরোধী সমাবেশে তিনি জোরালোভাবে বলেন:

> চীনের খেত-খামার জাপানি সৈন্যদের ঘোড়ার পদচারণায় পিষ্ট হচ্ছে। দেশের সীমানা রক্ষাহীন, আক্রমণকারীরা প্রবেশ করছে, আগুন দিচ্ছে, হত্যা করছে, লুণ্ঠন করছে। কিন্তু মানবজাতির সভ্যতা জানোয়ারের দ্বারা ধ্বংস হতে পারে না, সত্য এবং ন্যায়বিচার পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে না। সাহসী এবং শক্তিশালী চীনা জনগণ ইতোমধ্যেই তাদের জীবনের জন্য যুদ্ধ করছে, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তারা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে। আমরা, ভারতের জনগণ, তাদের এই দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নিচ্ছি। আমরা চীনা ভাইদের পাশে থেকে আক্রমণকারীদের পরাজিত করব।

১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে, তিনি জাপানে বসবাসরত এক ভারতীয় বন্ধুকে একটি চিঠিতে লিখেন: "আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে, আমি এই জাতির মহত্ত্ব সম্পর্কে আমার পূর্ব ধারণা সংশোধন করতে বাধ্য হব, তাও অনুশোচনা সহকারে।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ভ্রান্ত কল্পনা থেকে মুক্তি পেয়ে জাপানের আগ্রাসী আচরণের নিন্দা করতে শুরু করেন।

তিনি শুনেছিলেন যে জাপানি সামরিকবাদী সৈন্যরা বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধের কাছে তাদের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করছিল। এই সংবাদে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে একটি কবিতা লিখেন, যেখানে জাপানি আগ্রাসনকারীদের অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ এবং সমালোচনা করেন:

> হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
> সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
> সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকট-দর্শন
> দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
> হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
> সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির,
> ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
> বুদ্ধের মন্দির তলে।
> তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
> ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।
>
> গর্জিয়া প্রার্থনা করে
> আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
> আত্মীয় বন্ধন করি দিবে ছিন্ন
> গ্রামপল্লীর র'বে ভস্মের চিহ্ন;
> হানিবে শূন্য হতে বহ্নি আঘাত,
> বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ,
> বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
> দয়াময় বুদ্ধের কাছে।
> তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,

ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।
হত আহতের গনি 'সংখ্যা
তালে তালে মন্দ্রিত হবে জয়ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষ বাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিঃশ্বাস,
মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।
তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো॥

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ঘৃণা এবং ক্রোধের প্রকাশ অত্যন্ত তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আজ যখন আমরা এই কবিতাটি পুনরায় পড়ি, তখন মনে হয় যেন ৭৫ বছর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের সেই ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত এবং তীব্র দৃষ্টিতে তাকানো রূপটি চোখের সামনে ভেসে ওঠছে।

১৯৩৭ সালের ৭ জুলাই লু কও চিয়াও ঘটনার সময়, জাপান তাদের আক্রমণের আগুন সমগ্র চীনে ছড়িয়ে দেয়। এই সংবাদ জানতে পেরে কবি রবীন্দ্রনাথ আরো রুষ্ট হন। তিনি যখন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত চীনা ছাত্র ওয়েই ফংজিয়াং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন বলেন:

> আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে চীনকে কেউ জয় করতে পারবে না। জাপানি আক্রমণকারীরা যত নির্মম হবে, তাদের পতন ততই দ্রুত হবে। চীন অবশ্যই স্বাধীনতা এবং মুক্তি লাভ করবে।

সেই বছর, ২১ সেপ্টেম্বর, তিনি চীনা শিক্ষাবিদ চাই ইউয়ানপেই-এর টেলিগ্রামের উত্তরে বলেন:

> তোমাদের মহান ও শান্তিপূর্ণ ভূমিতে যে ভিত্তিহীন আক্রমণ চালানো হয়েছে, তার বিরুদ্ধে তোমাদের জনগণের সাহসী প্রতিরোধ আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে। আমি তোমাদের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করি। আমি এবং আমার দেশবাসী তোমাদের দেশের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানাই। আশা করি, তোমাদের বিজয়ের মাধ্যমে ন্যায়বিচার এবং মানবতার মহান শক্তি প্রতিফলিত হবে।

চিঠিতে তিনি জাপানের শাসকদের প্রকাশ্যে নিন্দা জানিয়ে লেখেন:

> আমার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে, সাহসী জাপানি জাতিকে তাদের শাসকরা এমন একটি পথে চালিত করেছে, যা পূর্বের সর্বোচ্চ আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন, শুধুমাত্র ভালোবাসার শিক্ষা দিয়ে আক্রমণকারীদের থামানো সম্ভব নয়। আক্রমণকারী যুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্য ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধই প্রয়োজন।

১৯৩৭ সালের ২১ অক্টোবর তিনি ভারতের "গুরু মার্কেট সংবাদপত্র"-এ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি চীনের শান্তিপূর্ণ শহরগুলিতে জাপানের বোমা হামলার নৃশংসতাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন এবং জাপানি পণ্য বর্জনের আন্দোলনের প্রতি জোরালো সমর্থন প্রকাশ করেন।

১৯৪১ সালের ৭ মে, তাঁর প্রখ্যাত প্রবন্ধ "সভ্যতার সংকট"-এ তিনি আবারও ব্রিটিশ এবং জাপানি সাম্রাজ্যবাদীদের চীনের ওপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন:

> ব্রিটিশরা লাভের জন্য শক্তির ওপর নির্ভর করে, চীনের মতো বিশাল এক সভ্য দেশকে আফিমের মাধ্যমে বিষিয়ে তুলে তার কিছু অংশ দখল করেছিল। যখন আমি সেই অতীতের মর্মান্তিক ঘটনাগুলি ভুলতে শুরু করেছি, তখন আবার দেখি জাপান উত্তর চীন দখল করে নিচ্ছে।

নোগুচি মিৎসুজির মতো ব্যক্তিদের চীন আক্রমণ নিয়ে জাপানের অপরাধকে সমর্থন করার যুক্তি খণ্ডন

জাপানি প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কটাক্ষ, তাঁর সাহসী এবং ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্রকে সবচেয়ে ভালোভাবে তুলে ধরে। বিশ্ববিখ্যাত কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের চীনের প্রতিরোধযুদ্ধে সমর্থন আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। জাপানি শাসকরা এই প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং তাঁকে প্রভাবিত করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আপসহীন ছিলেন এবং তাদের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। জাপানি শাসকরা তাঁর এই দৃঢ় অবস্থানে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল এবং রাসবিহারী বোস নামে জাপানে বসবাসরত একজন ভারতীয়কে কাজে লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি টেলিগ্রাম পাঠায়, যাতে তাঁকে অনুরোধ করা হয় জাপানবিরোধী বক্তব্য থেকে বিরত থাকতে।

রবীন্দ্রনাথ সেই টেলিগ্রাম পেয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যুত্তর দেন:

> প্রিয় রাসবিহারী,
> আজ একটি দেশ অন্য একটি দেশ আক্রমণ করছে, তার পাপ শুধু সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশেষত তাদের এই মানুষের প্রতি নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালানো, যেকোন মহামারীর চেয়েও ভয়ঙ্কর।। এই ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের বিবেক যখন আওয়াজ তোলে, তখন আমি এর প্রতিবাদ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারি না,এই প্রতিবাদ কোনও একক ব্যক্তির দ্বারা শুরু হয়নি; এটি সম্পূর্ণভাবে জনগণের বিবেক থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্থিত হয়েছে। সুতরাং, আমি আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন যে আমি আপনার অনুরোধ মেনে চলতে পারছি না। চীন থেকে ভেসে আসা সেই হৃদয়বিদারক আহ্বানগুলি সত্যিই অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং ভয়ঙ্কর।

পত্রটি সংবাদপত্রে পুনর্মুদ্রিত হওয়ার পর, জাপান সরকার অত্যন্ত রেগে গেল এবং একটি নতুন ষড়যন্ত্র তৈরি করল,জাপানের শাসকরা এরপর তাঁকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করে এবং "জাপান-ভারত সমিতি"-র পক্ষ থেকে উপহার পাঠায়। রবীন্দ্রনাথ এই উপহার পেয়ে ক্ষুব্ধ হন এবং প্রত্যুত্তর করেন:

> আপনার সমিতির উদার উপহার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ভালোবাসা গ্রহণ করার সময় আমি স্পষ্ট করতে চাই যে, জাপানের জনগণের প্রতি আমার যে ভালোবাসা আছে, তা কখনোই তাদের শাসকদের নীতির প্রতি সমর্থন নয়।

জাপানি কবি নোগুচি মিৎসুজির (নোগুচি ইয়োনে, ১৮৭৫-১৯৪৭) বক্তব্যের বিরোধিতা করা আবারও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দেয়। নোগুচি মিৎসুজি একসময় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। নোগুচি

মিৎসুজিরো, যিনি একসময় রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক বন্ধু ছিলেন, কিন্তু তার কথাবার্তা এবং আচরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাগের উদ্রেক করেছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কয়েকবার চিঠি লিখে নিজের প্রকৃত চেহারা প্রকাশ করে দেন এবং জাপানি সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার ও সহযোগীতে পরিণত হন। নোগুচি জানতেন যে জাপানি আগ্রাসনকারীদের চীনে নৃশংসতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তাই তিনি এই নৃশংসতাকে সমর্থন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

নোগুচি মিৎসুজিকে পাঠানো এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন:

> ... যখন তুমি বলো, 'পদ্ধতিটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হলেও, এশিয়ায় একটি নতুন মহান পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য এটি অনিবার্য'— আমার মনে হয় তুমি চীনা নারী ও শিশুদের উপর বোমাবর্ষণ, প্রাচীন মন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের কথা বলছ, যা এশিয়ার জন্য চীনকে রক্ষা করার একটি পদ্ধতি। তুমি প্রকৃতপক্ষে এমন একটি পথকে মানবজাতির উপর আরোপ করতে চাও, যা এমনকি পশুদের মধ্যেও অনিবার্য নয়। ... তুমি মৃতদেহের স্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে তোমার এশিয়ার ধারণা নির্মাণ করছ। আমি বিশ্বাস করি, এশিয়ার যে দায়িত্ব রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে তোমার উল্লেখ করা মতো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি কখনো ভাবিনি যে এই দায়িত্ব ভয়ংকর শক্তি বৃদ্ধির কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানি আগ্রাসনকারীদের সতর্ক করে বলেন:

> আমি নিজ চোখে দেখেছি, শাসকদের আদেশে একদল সশস্ত্র জাপানি প্রতিবেশী দেশে গিয়ে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের উপর অমানবিক সামরিক অভিযান চালিয়ে ইতিহাসে তাদের নাম কালিমাযুক্ত করে গেছে। এমন দৃশ্য দেখে আমি অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করি।

নোগুচি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি পাওয়ার পরও হাল ছাড়েননি। তিনি আবার চিঠি লিখে কৌশলে মিথ্যা যুক্তি, পাল্টা দোষারোপ, হুমকি এবং মিষ্টি কথার মিশ্রণে একটি জটিল জাল বুনে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন, যাতে তিনি জাপানি আগ্রাসনের নৃশংসতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন।

১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোগুচির নতুন আক্রমণের জবাবে আরেকটি চিঠি লিখে তাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। নোগুচি তার চিঠিতে উন্মত্ত হয়ে চীনা জনগণকে "অসৎ" বলে অপবাদ দেন। নিজেরা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েও সমস্ত দোষ জাপানিদের ওপর চাপানোর কথা উল্লেখ করেন এবং প্রকাশ্যে জাপানি সেনাদের নৃশংসতার সাফাই দেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার চিঠিতে বলেন:

> তোমার এই উদ্ভট যুক্তি আমাকে নেপোলিয়নের কথা মনে করিয়ে দেয়। যখন তিনি একটি শূন্য নগরী মস্কোতে প্রবেশ করেছিলেন এবং তার প্রাসাদগুলোকে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে যেতে দেখেছিলেন, তখন তিনিও একই ধরনের 'মহৎ ক্ষোভ 'প্রকাশ করেছিলেন।

এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যঙ্গ করে বলেন:

> যদি সত্যিই চীনারা নিজেদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে, নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংস করতে পারে, তবে তোমার এই মহৎ ক্ষোভ নিঃসন্দেহে সবার সমবেদনা পাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই তীক্ষ্ণ শব্দগুলো নোগুচির পাল্টা অভিযোগের অযৌক্তিকতাকে উদ্ঘাটন করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানি সেনাবাহিনীর বর্বরতা তুলে ধরেন

চীনাভাষায় রবীন্দ্ররচনাবলীর অনুবাদক ও সম্পাদক দং ইউছেন

এবং চীনা জনগণের উপর তাদের হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস স্মরণ করান। তবে চীনের প্রতি তিনি গভীর আস্থা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন:" চীনকে পরাজিত করা যাবে না। তার সভ্যতায় অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। তার জনগণ দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে অতুলনীয় ঐক্যের মাধ্যমে একটি নতুন শতাব্দী গড়ে তুলছে।" তিনি আরও বলেন: "যেকোনো সাময়িক বিপর্যয়ও তাদের অদম্য চেতনাকে ভেঙে দিতে পারবে না। আমি আশা করি, আমি যেই দেশকে ভালোবাসি সেই দেশের জনগণ সফল হবে না, তবে তারা তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য অনুশোচনা করবে।"

ব্রিটিশ শাসনের অধীনে উপনিবেশ ভারতবর্ষের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এমন এক অসম্মানজনক অবস্থানে থেকেও নিরাশ হননি। বরং ন্যায়পরায়ণতার দীপ্তি ধরে রেখে বিশ্বজুড়ে বর্বরতা, অন্যায় ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ এবং প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের কাজগুলো সর্বত্র তাঁর মহান চরিত্র, ন্যায়পরায়ণ মনোভাব এবং সীমাহীন মানবিকতার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্ম বিশ্ববাসীর কাছে প্রিয় এবং তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব সবার জন্য শ্রদ্ধা ও অনুকরণের বিষয়। আমি মনে করি, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যিই গুণ ও শিল্পে অনন্য একজন মহান সাহিত্যিক এবং শিল্পী। তিনি তাঁর সাহিত্য ও শিল্পকর্মের মাধ্যমে আমাদের মনকে পরিশীলিত করেছেন এবং তাঁর মহৎ চরিত্রের স্বচ্ছতায় আমাদের হৃদয়কে শুদ্ধ করেছেন।

খণ্ড ১৮, সংখ্যা ২৩
Vol. 19, No. 23

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

জুন 2025
June 2025

doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.3

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* উপন্যাস : রুশ ভাষায় অনুবাদ-অভিজ্ঞতা ও অনুবাদ-পদ্ধতি

ইভা লেকারেভা

বিভূতিভূষণের আরণ্যক *উপন্যাসের প্রচ্ছদচিত্র*

Bibhutibhushan Bandyopadhyay's Novel *Aranyak* : The Translation Experience into Russian and Methods

Eva Lekareva

Abstract

The article attempts to briefly characterize the main challenges and methods of their resolution undertaken by the author while translating the novel *Aranyak* (1939) by the renowned Bengali classic Bibhutibhushan Bandyopadhyay (1894–1950) into Russian. Reflecting the personal experiences of the writer and serving as a kind of "book of life" of the forest and its inhabitants, the novel is entirely devoted to the Forest—perhaps the most important and profound image in the narrative, revealing itself in various aspects: as the primary locus where the action unfolds, as an active multi-faceted character that is often personified and appears before the reader in different guises, and finally as a necessary Other, engaging in dialogue with whom allows the main character, Satyacharan, to gain a deeper understanding of himself. These aspects are extensively presented within the text at semantic, lexical, and syntactic levels. One of the main challenges in translation was selecting equivalent lexical units and organizing them into a syntactic structure similar to that of the original in order to preserve the richness of the forest imagery. Additionally, the article briefly addresses several specific translation difficulties and the strategies employed to resolve them.

২০২৩ সালের গ্রীষ্মে এম. এ. ডিগ্রি অর্জনের প্রাক্কালে মস্কোর একটি প্রকাশনা সংস্থা থেকে বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত রচয়িতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* উপন্যাসের অনুবাদ করার প্রস্তাব পেয়েছি। বাংলা সাহিত্যের এত বড় রচনার তরজমা করার আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই প্রস্তাবটি অপ্রত্যাশিত ও অত্যন্ত আনন্দজনক হলেও একটু ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। নীচে সম্মানিত পাঠকদের সামনে অনুবাদের এই অভিজ্ঞতাটি যে কী রকম হয়ে গেছে, এই পথে আমার যে কী কী ভুলভ্রান্তি ও সমস্যা ঘটেছে এবং তার সমাধান কীভাবে পাওয়া গেছে—এসব বিষয় নিয়ে অল্প একটু কথার ভাগ দিতে চাই। সেইসাথে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের শব্দার্থিক স্থানের বৈশিষ্ট্যগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছিল—তা নিয়েও কিছু পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করা হবে। তবে আমাদের পর্যালোচনা শুরু করার আগে লেখক এবং তাঁর জীবন ও রচনাবলী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিক মনে করি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)-এর জীবন ও রচনাবলী

১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির কাঁচরাপাড়ার কাছে মুরতিপুর গ্রামে মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে বিভূতিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড়। লেখকের মা মৃণালিনী দেবী সম্পর্কে নাম ছাড়া প্রায় কিছুই জানা যায় না; তাঁর বাবা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের একজন সম্মানিত বিশেষজ্ঞ বলে সুপরিচিত ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য এবং পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তিতে তিনি পালা রচনা করে নিজেই গাইতেন। এর জন্য তিনি সর্বজনীন স্বীকৃতি এবং খ্যাতি অর্জন করতেন। তরুণ বিভূতিভূষণ বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন; তিনিই ছেলেটির মনে সাহিত্যের প্রতি গভীর ভালোবাসা জাগিয়ে তোলেন, যা ভবিষ্যতে তাঁর জীবনকর্মে পরিণত হয়ে ওঠে। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে, তাঁর বাবা বিভূতিভূষণের কাছে আঙ্গুর চাইলেন। সেই সময় ফলটি তাঁদের পরিবারের জন্য একটি অসাধ্য বিলাসিতা ছিল, এবং যুবকটি পিতার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পারেননি এবং সারা জীবন আর কখনও আঙ্গুর খাননি।[১]

বারো বছর বয়সে স্থানীয় গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে বিভূতিভূষণ বাবার সাথে বনগাঁ যান এবং বনগ্রাম বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বালকের ওখানে পড়াশোনা করার জন্য তাঁর বাবা বউয়ের রূপার বেল্টটি বিক্রি করতে বাধ্য হন। ১৯১৪ সালে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে

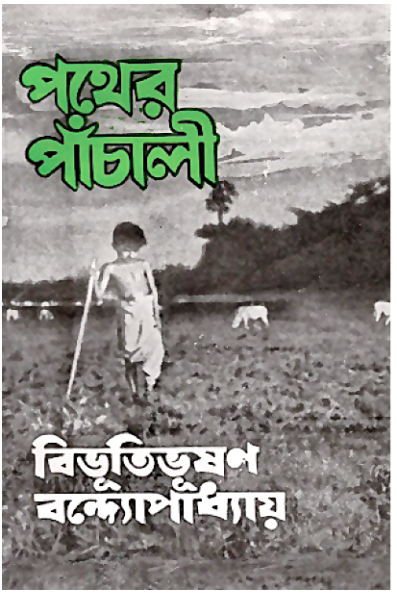

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস পথের পাঁচালী *ও* চাঁদের পাহাড়*-এর প্রচ্ছদচিত্র*

উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার লর্ড রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজ) ভর্তি হন ও দুই বছর পর ১৯১৮ সালে অ্যাসোসিয়েট অফ আর্টস ডিগ্রি এবং তারপর বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। বিভূতিভূষণ যখন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র তখন গৌরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। তাঁর পিতার আগ্রহে লেখক পড়াশুনা করতে থাকেন, কিন্তু প্রসবকালীন গৌরী দেবীর মর্মান্তিক ও আকস্মিক মৃত্যু হয়, এরপর প্রয়োজনের তাড়নায় ১৯১৯ সালে শোকসন্তপ্ত বিভূতিভূষণ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে জাঙ্গীপাড়া নামক ছোট্ট গ্রামে স্কুল শিক্ষকের চাকরি পান।[২]

এই মুহূর্ত থেকে নিজের পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য লেখকের জীবনে স্থানান্তর এবং চাকরি পরিবর্তনের দীর্ঘ ধারাবাহিকতার শুরু হয়: তিনি পূর্ববঙ্গ, বার্মা এবং দক্ষিণ বিহারের ভিন্ন-ভিন্ন শহর ও নগরে গিয়ে আলাদা-আলাদা পদে—স্কুল শিক্ষক, ব্যক্তিগত সচিব, এমনকি এস্টেট ম্যানেজার হিসেবেও—কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। মনে হয় এই জোরপূর্বক স্থানান্তর ও ভ্রমণগুলি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃজনশীল দিগন্ত এবং আধ্যাত্মিক খোঁজের প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল এবং জীবনের বাস্তবতার বৈচিত্র্যময় চিত্র দিয়ে তাঁর প্রাকৃতিক প্রতিভাকে পুষ্ট করেছিল। পরবর্তীকালে এর অনেক চিত্র তাঁর রচনাগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই অর্থে দক্ষিণ বিহারের ভাগলপুর জেলায় ছয় বছরের (১৯২৪-১৯৩০) লেখকের অবস্থান বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। ওখানে তিনি খেলতচন্দ্র ঘোষের বিশাল সম্পত্তি পরিচালনা করতে গিয়ে নতুন বসতি এবং পল্লী গড়ার জন্য জমি উন্নত করেছিলেন। এই নির্জন অরণ্যাঞ্চলের জীবনযাত্রা এবং এর বাসিন্দাদের কঠিন ভাগ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈল্পিক-শৈলীর উপর বিরাট প্রভাব ফেলে, যা তাঁর রচনাবলীতে প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর প্রাধান্য এবং আত্মজীবনীমূলক প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়।

তাঁর অনেক রচনার নায়করা প্রাকৃতিক জগতের সাথে অবিচ্ছেদ্য ঐক্যে জীবনযাবন করে: *পথের পাঁচালী*-র ছোট অপু এবং তার বোন দুর্গা, যা লেখককে খ্যাতি প্রদান করে বাংলা সাহিত্য সংসারে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল (তারপর যখন ১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায় একই নামে তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন, উপন্যাসটি বাংলার সিনেমার জগতে প্রবেশ করে নতুন জীবন খুঁজে পেয়েছে); বা *চাঁদের পাহাড়* (১৯৩৭)-এর মুখ্যচরিত্র যে টাকা উপার্জনের জন্য আফ্রিকায় ভ্রমণ করল; বা আরণ্যক (১৯৩৯)-এর দক্ষিণ বিহারের বনাঞ্চলের ভূমিহীন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও গঙ্গোতা, যার সাথে পরিচয় কলকাতার সভ্যতায় লালিত সত্যচরণের জীবন গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে; বা ইছামতি (১৯৫০) নামের উপন্যাসের ইচ্ছামতি নদীর তীরে গ্রামের বাসিন্দাদের জীবন, যে লেখাটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯৫১ সালে মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত করে।

লেখকের জীবনের শেষ দশক তাঁর জন্মস্থান বারাকপুর শহরে কেটে গেল, যেখানে ১৯৪০ সালে লেখিকা রমা দেবীর সাথে বিয়ে করে তিনি ফিরে এলেন। ১৯৪৭ সালে তাঁদের ছেলে তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। এই সময় ধরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখালেখি করতে থাকেন, গোপালনগরের হরিপদ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করাতে করাতে। ১৯৫০ সালে লেখকের জীবন কেড়ে নেওয়া এক অপ্রত্যাশিত হার্ট অ্যাটাকের ফলে তাঁদের পারিবারিক জীবনের শান্ত ও প্রবাহ ব্যাহত হয়।[৩]

অসাধারণ ভাগ্যের মানুষ, উর্বর লেখক, সংবেদনশীল ও মনোযোগী পর্যবেক্ষক, তিনি তাঁর রচনায় সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি, বিশেষ করে ওই যুগের গ্রামীণ ভারতের লোকের জীবনযাপন, তাদের সমস্ত আনন্দ, কষ্ট, ছোট ছোট জয়-বিজয় এবং পরাজয়ের ছবি তুলে ধরেছেন। এই অর্থে তিনি বাস্তববাদের ঐতিহ্যকে অব্যাহত রেখেছেন, যার ভিত্তি তাঁর বিখ্যাত প্রবীণ সমসাময়িক লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) স্থাপন করেছেন, এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের নাম চিরকালের জন্য লিখে নিয়েছেন।

আরণ্যক উপন্যাসটি ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হল এবং সত্যচরণ নামক একজন বয়স্ক বাঙালির গম্ভীর অনুতাপ ও শোকের গল্প বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। প্রায় পনেরো-ষোল বছর আগে তার বন্ধুর অনুরোধে সে বিহারের দক্ষিণ অঞ্চলে গিয়ে মিত্রের বাবার বিশাল জমিদারি পরিচালনা করতে লাগল। প্রথমে এই অরণ্য ও জনবসতিহীন বনভূমি সত্যচরণের মনকে চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে তোলে; এবং যুবকটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখান থেকে পালিয়ে যেতে চায় যাতে এই ভয়ঙ্কর অরণ্য প্রকৃতি বা এই সব অসভ্য বন্য লোকের সঙ্গে তার কোনও মিল না হয়। কিন্তু ব্যাপারটা হল এই যে সত্যচরণ যতই এই আরণ্যভূমি এবং এর বাসিন্দাদের সাথে পরিচিত হতে থাকে, ততই তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভরে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ে। বন্যপ্রকৃতি সত্যাচরণের সামনে নিজের গুপ্ত-গুপ্ত রহস্য উদারভাবে খুলে প্রতিবারই তাঁর কাছে সৌন্দর্যের নতুন দিকটি প্রকাশ করে দেয়, যা যুবকের নিজ কথায় তার জন্য একেবারে অচেনা মনে হত; অরণ্য তাঁর চিন্তাভাবনার ধারা পরিবর্তন করে তাকে পরিচিত বাস্তবতাকে নতুনভাবে দেখতে প্রেরণা দেয়। এস্টেট ম্যানেজার হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করে ও জমিদারির আয় উন্নত করতে বাধ্য হয়ে সত্যচরণকে এই আরণ্যভূমি ও মানুষের মধ্যে শতাব্দী প্রাচীন ঐক্যের বন্ধন ভেঙে নতুন বসতি ও কৃষিক্ষেত্র তৈরী করার জন্য জমি পরিষ্কার করতে হয়। উপন্যাসটি

এই কাজের জন্য সত্যচরণের এক ধরণের অনুতাপের গল্প বলে পরিবর্তিত হয়ে যায়, কারণ সে নিজে আশা করে, "নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভাব শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়।"[৪]

আরণ্যক উপন্যাসের অনুবাদ-পদ্ধতি ও জটিলতা : সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্পষ্ট ছাপ সমেত (যদিও তিনি নিজেই এই কথাটির খুব বিরোধিতা করেছেন) উপন্যাসটি একটি বনগ্রন্থে পরিণত হয়ে যায়, যা পাঠকদের সামনে অরণ্য জীবনের একটি চিত্র এঁকে দেয়—এ কথাটি উপন্যাসের শিরোনামেও প্রতিফলিত আছে। তাই তো আশা করি যে *আরণ্যক* উপন্যাসের অনুবাদ-পদ্ধতি ও প্রধান জটিলতার আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এর শিরোনাম নিয়ে কয়েকটি মন্তব্য করলে সময় নষ্ট হবে না। বাংলা ভাষায় রচনাটির নাম আরণ্যক-এর আক্ষরিক অর্থ 'অরণ্য, অরণ্যের সাথে সম্পর্কিত'। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ঐতিহ্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসংগ্রহ এই নামেও পরিচিত। এই বনগ্রন্থের মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের নির্দেশাবলী অন্তর্গত আছে। অবশ্যই একটু অতিরঞ্জিত ও শর্তসাপেক্ষভাবে কথা বললে প্রথম কয়টি মাস ধরে এমন নির্জন অরণ্যাঞ্চলে থাকা সত্যচরণের এক ধরণের নির্বাসন ও তপস্যার মতো মনে হয়। কিন্তু এই বন্যপ্রকৃতি ও জীবনের সাথে ভালোভাবে পরিচিত এবং মুগ্ধ হয়েও সে নিজেই কখনও সম্পূর্ণভাবে না বন্যসন্ন্যাসী হতে, না এই জীবনধারার সঙ্গে একতানে মিলিত হতে সফল হয়নি।

অন্যদিকে উপন্যাসটিতে অরণ্য নিজে যে গভীরতম ও বহুমুখী চরিত্র বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। একটি বিশেষ জগতে পরিণত হয়ে বন্যপ্রকৃতি নিজস্ব নিয়ম ও সময় প্রবাহের সৃষ্টি করে চলে যায়। উপন্যাসের আলাদা আলাদা জায়গায় চার-পাঁচ মাস ও দুটি অধ্যায়ের শুরুতে তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার উল্লেখ হলেও নিশ্চিতভাবে শুধু এই কথা বলা যেতে পারে যে সত্যচরণ এই বন্যাঞ্চলে কমপক্ষে ছয় বা সাত বছর বসবাস করত। সে নিজেই অরণ্যের সময় প্রবাহের এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করে এমনভাবে তার বর্ণনা করে দেয়:

> কতকাল হইতে এই বন পাহাড় এই এক রকমই আছে। সুদূর অতীতের আর্যেরা খাইবার গিরিবর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বন তখনো এই রকমই ছিল; বুদ্ধদেব নববিবাহিতা তরুণী পত্নীকে ছাড়িয়া যে-রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করেন, সেই অতীত রাত্রিতে এই গিরিচূড়া গভীর রাত্রির চন্দ্রালোকে আজকালের মতোই হাসিত; তমসাতীরের পর্ণকুটিরে কবি বাল্মীকি একমনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে কবে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী, তমসার কালো জলে রক্তমেঘস্তূপের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, আশ্রমমৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে, সেদিনটিতেও পশ্চিম দিগন্তের শেষ রাঙা আলোয় মহালিখা-রূপের শৈলচূড়া ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেমন হইয়া আসিতেছে। সেই কতকাল আগে যেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন; গ্রীকরাজ হেলিওডোরাস্ গরুড়ধ্বজ-স্তম্ভ নির্মাণ করেন; রাজকন্যা সংযুক্তা যেদিন স্বয়ংবর-সভায় পৃথ্বীরাজের মূর্তির গলায় মাল্যদান করেন; সামুগড়ের যুদ্ধে হারিয়া হতভাগ্য দারা যে রাত্রে আগ্রা হইতে গোপনে দিল্লী পলাইলেন; চৈতন্যদেব যেদিন শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্তন করেন; যেদিনটিতে পলাশীর যুদ্ধ হইল—মহালিখারূপে ঐ শৈলচূড়া, এই বনানী ঠিক এমনি ছিল।[৫]

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর আরণ্যক *উপন্যাসের রুশ অনুবাদক ইভা লেকারেভা*

এই অর্থে সত্যচরণের কথিত সমস্ত গল্প—যেমন ধরুন খিদে প্রায় মরে যাওয়া অভাগ্য মুসম্মত কুন্তাকে নিয়ে, বা আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে চোরানো বিশ্বস্ত ও সরল বন্য মেয়ে মঞ্চীকে নিয়ে, বা নম্র ও স্বার্থহীন মহাজন ধাওতাল শাহুকে নিয়ে, বা হয়তো প্রতিভাবান বালক নাটুয়া ধাতুরিয়াকে নিয়ে, যার সারা জীবনের স্বপ্ন কখনও সম্পূর্ণ হয়নি, বা উদাহরণস্বরূপ রাজ্যহীন সুন্দরী রাজকুমারী ভানুমতীকে নিয়ে, বা অবশেষে বন্য মহিষের রক্ষক-দেবতা টাঁড়বারোকে নিয়ে—শুধু এক রকম ক্ষণস্থায়ী সামান্য ঘটনা যে এই অরণ্যভূমির অস্তিত্বের সমুদ্রের সমতল পৃষ্ঠের উপর হালকা ঢেউয়ের মতো দৌড়ে ভেসে যায়: বছর পর বছর কেটে যাবে, এবং মহালিখারূপের শৈলমালা ঠিক এমনিতেই রইবে।

স্বয়ং বন ও কতকটা আখ্যানের মধ্যে সময়ের এই বিশেষ প্রবাহকে জোর দেওয়ার চেষ্টা করে বাংলার শিরোনামের অনুবাদ একটু পরিবর্তিত করে রুশ পাঠকদের সামনে "Once upon a time in the forest" [রুশ ভাষায় «Однажды в лесу» (অদ্নাজদি ভ লেসু)] রূপে উপস্থাপন করেছি। নিজেও এখনও পুরো আশ্বাস নেই এ রকম করা উচিত ছিল কিনা এবং নিজের ব্যক্তিগত মতামত পাঠকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছি কিনা, তা হয়তো তাঁরাই বিবেচনা করলে ভালো হবে।

অরণ্য বিষয়টির আলোচনায় আগে এগিয়ে গেলে উপন্যাসের সমৃদ্ধ উদ্ভিদ জগতের গাছ-লতার অনুবাদের পথে যে জটিলতা পড়েছে তা নিয়েও একটু চর্চা করা দরকার। আখ্যানের মধ্যে চরিত্রদের উল্লেখিত বিভিন্ন গাছপালা, লতা এবং ফল-ফুলের শনাক্ত ও অনুবাদ করা যে একটি সাধারণ কাজ হয়েছিল তা একেবারে নয়। এই উদ্ভিদ সমূহের রুশ ভাষায় কয়েকটি সামর্থ শব্দ খুঁজে নিয়ে অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছি। এই ধরনের গাছের মধ্যে রয়েছে বাদাম [রুশ ভাষায় миндаль (মিন্ডাল)], শাল [сал, саловое дерево (শাল, শালোভয়ে দেরেভো)], বট [баньян, баньяновое дерево (বান্যান, বান্যানোভয়ে দেরেভো)], কেঁদ [хурма (খুরমা)], আমলকী [миробалан (মিরোবালান)], তেঁতুল [тамаринд (তামারিন্দ)], নিম [дерево ним (দেরেভো নিম)] আদি; ঝাউ, ফুল, লতার মধ্যে উদাহরণ করতে গেলে এ রকম প্রজাতি বলা যায়: শিউলি ফুল [ночной жасмин

(নোচনোয় জাস্মিন)], আখ [сахарный тростник (সাখারনিয় ত্রোস্তনিক)], বাঁশ [бамбук (বামবুক)] ইত্যাদি।

এ কথাও উল্লেখ করা উচিত যে ইংল্যান্ডের সাটন ক্যাটালগ থেকে যে কিছু বিদেশী পুষ্প সত্যচরণ গ্রাহক করে আনল, সেগুলোর জন্য সে ইংরেজির বা বোটানিক্যাল নাম ব্যবহার করে, এবং এই রকম পরিস্থিতিতে তার দৃষ্টান্ত অনুযায়ী অনুবাদ করেছিলাম। উদাহরণস্বরূপ, হোয়াইট বিম [круглолистная рябина (ক্রুগ্লোলিস্তনায়া রিয়াবিনা)], রেড ক্যাম্পিয়ন [дрема красная (দ্রেমা ক্রাস্নায়া)], স্পাইডার লিলি [паучья лилия (পাউচ্যা লিলিয়া)], ফক্সগ্লাভ [наперстянка (নাপেরস্ত্যানকা)], উড অ্যানিমোন [ветреница дубравная (ভেত্রিনিৎসা দুব্রাভনায়া)], ডগ রোজ [шиповник (শিপোভনিক)], হানিসাকল [жимолость (জিমোলোস্ত)] ইত্যাদি।

দুঃখের বিষয় উপন্যাসে উল্লেখিত বিবিধ উদ্ভিদের সমূহের এমন একটা গোষ্ঠী রয়ে গেছে যার জন্য রুশ পাঠকদের কাছে পরিচিত সমার্থক বিকল্প খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়েছিল। এগুলো বাংলার উচ্চারণে (অর্থাৎ ট্রান্সক্রিপশন রূপে) রুশ অনুবাদে সংরক্ষিত আছে। আশা করি যে পাঠকদের জন্য এই অনুবাদ-পদ্ধতি অসুবিধাজনক না হয়ে বাংলা ভাষার মিষ্টি উচ্চারণের রস একটু করে স্বাদ নেওয়ার সম্ভাবনা মিলবে। তাছাড়া সত্যচরণ নিজে অমুক গাছ, ফুল বা লতার উল্লেখ করে তার ফোটানোর রঙ বা পাতার আকার বর্ণনা করে দেয়। তার জন্য মনে হয় যে উপন্যাসে অঙ্কিত অরণ্য চিত্রগুলো পাঠকদের কাছে একেবারে মুখহীন ও বর্ণহীন বলে হয়ে যাবে না। যেমন ধরুন, বসন্ত নেমে এই বনপ্রান্তরে হলুদ রঙের গোলগোলি ফুলের মেলা হয়; বা দুধলি ফুলের সুবাস বসন্তের আগমন ঘোষণা করে চারিদিকে হলুদ গালিচা দিয়ে ঢেকে দেয়, এবং ভোমরা লতার ফুলের (কৌতূহলজনক বিষয় এই যে সত্যচরণ নিজেই এই নামটি দিল, এর স্থানীয় নাম ভিঁয়োরা) সুঘ্রাণ "অতি চমৎকার, অনেকটা যেন প্রস্ফুটিত সর্ষে ফুলের মতো—তবে অতটা উগ্র নয়।"[৬]

এ কথা অস্বীকার করলে চলবে না যে, *আরণ্যক* উপন্যাসের উদ্ভিদ জগৎ একটি বৃহৎ ও বিবরণীয় বিষয় হয়ে এত ক্ষুদ্র পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং বিশালতর বিশ্লেষণের যোগ্য। অনুবাদ-পদ্ধতি ও জটিলতার আলোচনা করতে গেলে আমাদের চর্চায় এগিয়ে যাওয়া যাক। ব্যাপারটা এই যে অরণ্য বিষয়টি একেবারে দূর করতে অসক্ষম হবো, কেননা উপন্যাসে বন স্বয়ং যে শুধু অন্যতম বিশিষ্ট চিত্র তা নয় কেন্দ্রীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বলে পরিণত হয়ে যায়। এটি কেবল বিচিত্র সময়ের প্রবাহ বা উদ্ভিদ জগতের সমৃদ্ধির সাথে সম্বন্ধিত নয়, তাছাড়া ভাষার রূপেও আত্মপ্রকাশ করে দেয়।

একদিকে সত্যচরণের ব্যবহৃত বর্ণনার নিবিড়, সুসজ্জিত এবং কুটিল ভাষা বনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বললে হয়তো অতিবর্ণনা হবে না। এই পরিস্থিতিতে ভাষার সমস্ত মাধ্যম—ছন্দ, শব্দভাণ্ডার, বাক্য গঠন—অরণ্যের চরিত্রের যতটা সম্ভব ব্যক্ত করে সারা আখ্যান জুড়ে এই চিত্রের বৈচিত্র্য সমর্থন করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। এরকম গভীরতম ব্যক্তিগত এবং অকপট মুহূর্তে, লেখাটি নিজেই যেন ঘন বনঝোপের মতো পরিণত হয়ে যায়। এবং পাঠকের অপ্রত্যাশিত মন বিশ্লেষণ (ইংরেজিতে যাকে epithet বলা হয়), রূপক এবং তুলনার শৃঙ্খলে হারিয়ে যায়। ধারণাটি একেবারে ভিত্তিহীন না লেগে শুধু এইটুকু দৃষ্টান্ত রেখে দিই:

> কত রূপে কত সাজেই যে বন্যপ্রকৃতি আমার মুগ্ধ অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া আমায় ভুলাইল!—কত সন্ধ্যা আসিল অপূর্ব রক্তমেঘের মুকুট মাথায়, দুপুরের খরচর রৌদ্র আসিল উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশে, গম্ভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবরণী সুরসুন্দরীর সাজে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশভরা তারার মালা গলায়—অন্ধকার রজনীতে কাল-পুরুষের আগুনের খণ্ড হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালীমূর্তিতে।[৭]

অন্যদিকে সমস্ত বর্ণনা পাঠকদের কাছে সত্যচরণের উপলব্ধিতে (যাকে ইংরেজিতে focalization বলে ডাকে) দেওয়া হওয়ায় এরকম জটিল ও অতি অলঙ্কৃত ভাষা তার ভাষাগত প্রতিকৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে এই কথার প্রমাণ বলে পরিণত হয়ে যায় যে অরণ্য যুবকের উপর গম্ভীর প্রভাব চেপে বসেছিল। ঠিক এমনটাই যেমন তার কাছাকির গোষ্ঠ-বাবু নামক একজন বৃদ্ধ বাঙালি কর্মচারী তাকে সাবধান করে দিল:

> জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে। কোন গোলমাল কি লোকের ভিড় ক্রমশ আর ভালো লাগবে না। আমার তাই হয়েছে মশাই। এই গত মাসে মুঙ্গের গিয়েছিলাম মোক্তদমার কাজে—কেবল মনে হয় কবে এখান থেকে বেরুব।[৮]

সত্যচরণের চিন্তাধারা এই ঘন বনঝোপের মতো জটিল, আঁকা-বাঁকা ও কুটিল হয়ে ওঠে। কৌতুহলযোগ্য বিষয় এই যে সংবেদনশীল চুপচাপ স্বভাবের দার্শনিক সত্যচরণের পাঠকদের জন্য উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটি হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ।

এই কারণে বেশির ভাগে লেখকের বাক্যের দৈর্ঘ্য অনুবাদে যথাসম্ভব বজায় রাখা হয়েছিল যাতে রুশ পাঠকদের সত্যচরণের গম্ভীর অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা অল্প একটু অনুভব করার সম্ভাবনা মেলে যায়। পূর্বে লিখিত বাক্যের রুশ ভাষায় অনুবাদ দিয়ে দিচ্ছি:

> Сколько нарядов и форм сменила эта лесная чаровница, всякий раз представая перед моим зачарованным взором в новом обличье и еще больше пленяя меня. То являлась вечерами, увенчав голову диадемой из невиданных багровых облаков, то приходила в жаркий полуденный зной, приняв облик сводящей с ума Бхайра́ви, то обратившись небесной а́псарой, накидывала на плечи сотканную из лунного света вуаль, умащала тело ароматом свежих лесных цветов, украшала грудь гирляндой из звезд и посещала меня глубокими ночами, а иногда становилась грозной Ка́ли и разрубала ночную тьму мечом яркого света созвездия Ориона.
>
> [স্কোলকো নারিয়াদোভ ই ফর্ম স্মেনিলা এতা লেস্নায়া চারোভনিৎসা, ভ্সাকিয় রাজ প্রেদস্তাভায়া পেরেদ মোয়িম জাচারোভান্নিম ভ্জোরোম ভ নভম অব্লিচিয়ে ই ইশ্চো বোলসে প্লেনিয়ায়া মেন্যা. তো য়াভলিয়ালাস ভেচেরামি, উভেনচাভ গোলোভু দিআদেমোয় ইজ নেভিদান্নিখ বাগ্রোভিখ অবলাকোভ, তো প্রিখোদিলা ভ জারকিয় পোলুদেন্নিয় জেন্যায়, প্রিন্যাভ অবলিক স্ভোদিয়াশেয় স উমা ভাইরাভী, তো অভ্রাতিভসিস নেবেস্নোয় আপসারোয়, নাকিদিভালা না প্লেচি সোৎকান্নুয়ু ইজ লুন্নোগো স্ভেতা ভুয়াল, উমাশালা তেলো আরোমাতম স্ভেজিখ লেস্নিখ ৎস্ভতোভ, উক্রাসালা গ্রুজ গির্লিয়ান্দোয় ইজ জেভাজ্দ ই পোসেশালা মেনিয়া গ্লুবোকিমি নোচামি, আ ইনোগ্দা স্তানোভিলাস গ্রোজনোয় কালী ই রাজরুবালা নোচনুয়ু তিমু মেচোম ইয়ার্কোগো স্ভেতা সোজভেজিয়া অরিওনা।]

আশা করি যে রুশ ভাষা হয়তো ভালোভাবে না জেনেও এই দৃষ্টান্ত থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, অনুবাদ করতে গিয়ে এই বাক্যের দৈর্ঘ্য বেড়েছে। এই কথা উল্লেখ করা উচিত যে এরকম পরিবর্তন প্রায়ই ঘটেছে এবং রুশ ভাষার ব্যাকরণ এবং বাক্য গঠনের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত।

এই বাক্যটি উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে অনুবাদে ব্যবহৃত আরও কয়েকটি অনুবাদ-পদ্ধতি দেখিয়ে দিতে চাই। সত্যচরণের উল্লেখিত সকল নাম (যেমন ধরুন—ভৈরবী, সুরসুন্দরী বা কালী; রুশ বাক্যে তির্যক অক্ষরে লিখিত), যে রুশ পাঠকদের অপরিচিত হতে পারে, এরকম নামের জন্য পাদটীকায় সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেকোনো অচেনা তত্ত্ব (ইংরেজিতে reality বলা যায়) ব্যাখ্যা করতে হলে একই পদ্ধতির ব্যবহার করা হল: উদাহরণস্বরূপ, ঢেঁকি বললে কী বোঝায় বা ভারতে মকর সংক্রান্তি কীভাবে মানানো হয় ইত্যাদি।

লেখাটির শেষে উপন্যাসে পাওয়া যাওয়া ভৌগোলিক ও ব্যক্তিগত নামগুলোর রুশ ভাষায় অনুবাদ পদ্ধতি নিয়ে অল্প একটু আলোচনা করা দরকার। রুশ পাঠকদের বাংলা ভাষার উচ্চারণ দিয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে বলে, এরকম নাম অনুবাদ করতে গেলে যথাসম্ভব পরিস্থিতিতে ট্রান্সক্রিপশনের পদ্ধতি ভিত্তি করে নেওয়া হল। তবে কারো নামের জন্য (যেমন ধরুন—কোনও দেব-দেবী বা পৌরাণিক ঋষি আদি) রুশ ভাষায় একটি নির্দিষ্ট অনুবাদস্বরূপ হলে, এই অনুবাদের ঐতিহ্যকে মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হল।

অবশ্যই আরণ্যক উপন্যাসটির তাৎপর্যমালা, অনুবাদ পদ্ধতি ও জটিলতার পর্যালোচনা আজকের মতো ক্ষুদ্র চর্চার সীমাবদ্ধ হয় না। তা সত্ত্বেও আশা করি যে, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা পড়েও উপন্যাসটি যে কীভাবে রুশ ভাষায় পরিবর্তিত হয়েছিল এই বিষয় নিয়ে অল্প একটু ধারণা সম্মানিত পাঠকদের কাছে দিতে সক্ষম হয়েছি।

তথ্যসূত্র

[১] জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী. "জীবনের কথা/বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়". *আরণ্যক.* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৭১. পৃ. ১.

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২.

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩.

[৪] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়. *আরণ্যক.* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৭১. পৃ. ২.

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬.

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩.

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬.

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯.

খণ্ড ১৯, সংখ্যা ২৩
Vol. 19, No. 23

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

জুন ২০২৫
June 2025

doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.4

হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পে চরিত্র সৃষ্টির কৌশল : প্রেমে পড়া যুবকের দুটি দৃষ্টান্ত

লু মেংকি

হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পের শিরোনামে কোলাজ চিত্র

Character Creation Techniques in Humayun Ahmed's Short Stories: Two examples of a young man in love

Lu Mengqi

Abstract

Humayun Ahmed is one of the most influential Bengali writers in modern times. His works are not only famous for their magical realism, but also widely loved for their outstanding character creation. The young man in love is a representative character image in Humayun's short stories. Humayun is good at describing characters from language, psychology, action and other aspects, and making a comprehensive description of the characters, and deeply analyzing the characters' humanity, personality, psychology, fate, etc. He is good at use of the first-person perspective to shape the image of young men in love, describing the tragic story with plain tone. This contrast in form, content and emotion leaves a deep impression on readers and produces a shocking "empathy" effect. Based on the text analysis of Humayun's short stories, this paper selects "young man in love" as representative classic characters in Humayun's short stories, tries to summarize the characteristics of the characters, and preliminarily explores his character creation techniques.

বিংশ শতাব্দীর বাঙালি জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ অন্যতম। তাঁকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি আধুনিক বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পথিকৃৎ। তিনি অনেক সফল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর গল্প ও উপন্যাসে সংলাপের প্রধান্য প্রত্যক্ষ করা যায়। মাত্র কয়েকটি বাক্যের মাধ্যমে চরিত্র চিত্রণের অদৃষ্টপূর্ব প্রতিভা রয়েছে তাঁর।

হুমায়ূন তাঁর রচনায় অনেক প্রেমিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তারা অধিকাংশই গভীরভাবে প্রেমে পড়ে, তাদের একটি সমৃদ্ধ সত্তা রয়েছে। প্রত্যেক ব্যর্থ সম্পর্কে তারা আত্মসমালোচনা করে, নিজেকে শাস্তি দেয়। তারা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে এবং প্রতিবাদ করতে প্রস্তুত। যদি তারা ব্যর্থ প্রেমের স্বাদ পায়, তাহলে তারা সেই মনমরা অবস্থা থেকে তাড়াতাড়ি সেরে উচিত পারে না। বরং দীর্ঘ দিন ধরে সেই প্রেমের আঘাত নিয়ে নষ্ট হওয়ার জন্য মরিয়া অবস্থায় পড়ে থাকে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল হুমায়ূনের দুটি সুন্দর ছোট গল্প—'একটি নীল বোতাম' এবং 'একজন ক্রীতদাস'। এ দু'টি ছোট গল্পের মধ্যে "আমি"-র মাধ্যমে প্রধান নায়কের কথাবার্তা ও ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া চলে। এমন পদ্ধতিতে পাঠকরা চরিত্রের অনুভূতি এবং মানসিক পরিবর্তন সহজেই বুঝতে পারে। হুমায়ূন প্রেমে পড়া যুবকের মনের অবস্থা এবং মানসিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। আমি 'একটি নীল বোতাম' এবং 'একজন ক্রীতদাস'-এ দু'টি গল্পের মাধ্যমে, বিভিন্ন সময়ে চরিত্রের মনের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করব এবং হুমায়ূনের চরিত্র সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা কৌশল বিচার করব।

১. একটি নীল বোতাম

একটি নীল বোতাম গল্পে, "আমি" একজন সাধারণ যুবক, যার বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। "আমি" এশাকে প্রথমবার দেখেই তাকে খুব ভালবেসে ফেলে। এশার বাবা একজন ধনী ভদ্রলোক। "আমি" একটা ফার্মে কাজ করে। "আমি" এশাকে বিয়ে করতে চাইলেও, এশা অন্য ছেলেকে বিয়ে করল। "আমি" শুধু দেখল, কিন্তু এশাকে পাওয়ার জন্য কিছুই করতে পারল না।

১.১ গল্পের বিকাশ ও চরিত্রের মানসিক পরিবর্তন

১.১.১ প্রারম্ভিক আশা ও ভালবাসায় আচ্ছন্নতা

এশার বাবা বারান্দায় বসেছিলেন। "আমি" চরিত্রের মনে হয়েছিল তাঁর গায়ে নীল রঙের গেঞ্জি তাঁকে সুন্দর মানিয়েছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে "আমি" খুব আগ্রহী ছিল, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলল না। এখানে দরিদ্র তরুণদের হীনমন্যতা, সংবেদনশীলতা এবং সংকীর্ণ মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। "তিনি আমাকে দেখতে

হুমায়ূন আহমেদের 'একটি নীল বোতাম' গল্পের একটি গ্রাফিক চিত্র

পান নি। আমি ইচ্ছা করেই গেটে একটু শব্দ করলাম। তিনি আমাকে দেখলেন।" "কিন্তু এশার বাবার সঙ্গে কথা বললে আমার মন-খারাপ ভাবটা কেটে যায়।"[১] "আমি" চরিত্রটি এশার বাবার সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করল, কারণ সে এশাকে খুব ভালবাসে। এশাকে ভালবাসার কারণে এশার বাবার সঙ্গ পেতে আগ্রহী। "মাঝে মাঝে এ-বাড়িতে এসে শুনি এশা নেই—মামার বাড়ি গেছে। রাতে ফিরবে না। তার মামার বাড়ি ধানমণ্ডিতে প্রায়ই সে সেখানে যায়। আমার মন খানিকটা খারাপ হয়।"[২] এটা প্রেমে পড়া যুবকের স্বাভাবিক চিন্তা। মনের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে সে আকুল হয়ে থাকে এবং তার মন সারাক্ষণ ছটফট করে। এশাকে দেখতে না পাওয়ার উৎকণ্ঠা যেন তাকে সর্বদাই জ্বালায়।

"আমি" চরিত্রের এবং এশার পরিবারের আর্থিক অবস্থার তফাৎ আছে। গরীব ঘরের ছেলে হয়ে "আমি" চরিত্রের মনের আড়ালে যেন সব সময় এক ধরণের সূক্ষ্ম সংকীর্ণতা কাজ করে। "... তিনি চায়ের কথা বলতে উঠে গেলেন। কী চমৎকার তাঁর এই ভদ্রতা। আমি কে? কেউ না। অতি সামান্য একজন। একটা এ্যাড ফার্মে কাজ করি। অল্প যে ক'টা টাকা পাই তার প্রতিটির হিসাব আমার আছে। আর এঁরা? আমার ধারণা, এদের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ান আমার চেয়ে বেশি টাকা পায়। নিতান্ত ভাগ্যক্রমে এঁদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে এ-বাড়িতে এসেছিলাম।"[৩] এই "আমি"র মনে হয় তার এবং এশার মধ্যে বিশাল তফাৎ আছে, সে আসলে জানে যে, এশার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তাই পরে এশা ভাল পরিবারের ছেলেকে বিয়ে করল। তবে তার মনে আশা ছিল, এ কারণে এশা অন্য ছেলেকে বিয়ে করার পর অনেক কষ্ট পায়।

এশাকে চেনার পর, "এই পরিবারটির সঙ্গে পরিচয় হবার পর আমার মধ্যে বড় ধরণের কিছু পরিবর্তন হল। আগে বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে চমৎকার লাগত। এখন আর লাগে না। একসময় মেয়েদের নিয়ে কেউ কোন কুৎসিত কথা বললে বেশ মজা পেতাম। এখন ভয়ংকর রাগ লাগে। মনে হয় এই

কুৎসিত কথাটি কোনো-না-কোনো ভাবে এশাকে স্পর্শ করছে।"[৪] এমন পরিবর্তনে খুব প্রগাঢ় কোন প্রতিফলন নেই, তবে পাঠকরা একজন প্রেমে পড়া যুবককে দেখতে পারে, তার মনের কথা অনুভব করতে পারে।

১.১.২ আত্ম-প্রতারণা ও আশার আলো

যখন "আমি" চরিত্রের বন্ধুরা ঠাট্টা করল যে, তার ঘরে মেয়ে মানুষের অভাব, তখন তার অনেক রাগ হয়েছিল। "মেয়ে মানুষ ছাড়া এই ঘর মানায় না। এক কাজ কর একশো টাকা দিয়ে একটা মেয়েমানুষ এক রাতের জন্য নিয়ে আয়। ফুর্তি কর। আমরা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখি। রাগে আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। কিছু বলি না। কী হবে বলে।" এমন রাগের কারণ হল সে এশাকে ভালবাসে, বন্ধুদের ঠাট্টা যেন তার আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাসকে ভীষণ আঘাত করে, আর সে কখনও চায় না কেউ তার ভালবাসার অনুভূতিকে অপমান করুক। "আমার ইচ্ছা করে এশাকে একদিন ওদের সামনে উপস্থিত করি। সেটা নিশ্চয়ই খুব অসম্ভব নয়। বললেই সে আসবে, তবে আমার বলতে সাহস হয় না।"[৫] সে ভাবে, সে এশার সামনে সাহসহীন, এমনকি পরিষ্কার জানি যে, এশার জন্য সে উপযুক্ত পাত্র নয়।

যখন "আমি" চরিত্রটি প্রথমবার এশাকে "তুমি" ডাকে। সে এশার চেয়ে বেশ বড় নয়, তবু এশা তার বন্ধু হয়, তবে সে ভয় পেল। "প্রথম যেদিন তাকে 'তুমি' বললাম কী প্রচণ্ড ভয়ে-ভয়েই না বললাম।... আমার মনে হল—এ কী করলাম আমি? আমার মাথা ঝিম-ঝিম করতে লাগল। আমার মনে হল সে এবার চোখে তাকিয়ে শীতল গলায় বলবে, আমাকে তুমি করে বলবেন না। এত ঘনিষ্ঠতা তো আপনার সঙ্গে আমার নেই।" এশার সামনে সে যেন একটি ছোট ছেলে, ভুল কাজ করতে ভয় লাগে। এশা কিছুই বলল না। তার মন যেন আকাশে উড়ল। "চৈত্র মাসের বিকেলে আমি গোলাপ ছাঁটতে লাগলাম। আমার ত্রিশ বছর জীবনের সেটা ছিল শ্রেষ্ঠতম দিন।"[৬] সে এত খুশি হয়েছিল যে, তার মনে হচ্ছিলো ছোট ছেলে মিষ্টি পেলে যেমন খুশি হয়, আজ সে তেমন খুশি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের এমন মানসিক ক্রিয়া—প্রতিক্রিয়া বিশেষ করে প্রেমে পড়া মানুষের বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়।

এশা সবিনয়ে বলল আবার আসবেন, এতে তার মন খুব ভাল হল, এবং পরের বার আসার চিন্তা করল। "এশা গেট পর্যন্ত এল। হাসিমুখে বলল, আবার আসবেন। এই কথাটি কি পৃথিবীর মধুরতম কথার একটি নয়? আমি আবার আসবো এ বাড়িতে। যতবার ইচ্ছা আসতে পারি। আমাকে কোনো অজুহাত তৈরি করতে হবে না।"[৭] এশার নিমন্ত্রণ তার জন্য যেন এক ধরনের উপহার, এশার বাড়ির সামনে সে খুব ছোট এবং দুর্বল। এখানে লেখক হুমায়ূন তাঁর চরিত্রের জটিল মনোজগতের পরিচয় তুলে ধরেছেন। একজন প্রেম-পাগল মানুষের মনের গভীরে সতত ক্রিয়াশীল আলো-আঁধারির জগৎ। এই জাতীয় প্রেম-পাগলের মস্তিষ্কে যুক্তি-টুক্তি নেই, আছে শুধুই আশা ও নিরাশা।

১.১.৩ অপারগ বাস্তবতার মুখোমুখি

গল্পের শেষে, এশার বাবা যখন এশার বিয়ের কথা আমাকে জানাল, "আমি" চরিত্রটি তখন কোনো কথা বলল না। বলার কোন উপায় ছিল না। আসলে তখন সে অনেক ব্যথা-বেদনা পেয়েছিল। এ দুর্ঘটনা তার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিল। "না, উৎসব কিছু না। মেয়েলি ব্যাপার। এশার বিয়ে ঠিক হল।... আমি নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে

লাগলাম।"[৮] "আমি" চরিত্রটি যেন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ল। নীল বোতাম যেন একটি উপমা, দেখতে পারি তবে স্পর্শ করতে পারি না চিরদিনের মত। এশা এত সুন্দর, তবে সে অন্য লোকের স্ত্রী হবে, তার নয়। নিষ্ঠুর বাস্তবতার সামনে "আমি" চরিত্রটি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে।

লেখক হুমায়ূন "আমি" ব্যবহার করে, একটি করুণ গল্প বললেন। তিনি প্রেমের মর্মান্তিক মনোবেদনায় আক্রান্ত একজন বাঙালি ছেলের চরিত্র সৃষ্টি করলেন। তাঁর বিবরণের ভাষা সাবলীল হলেও চরিত্রের ওপর তাঁর পরম মমতা সহানুভূতি ধরা যায় বাক্যে বাক্যে। সহানুভূতি হল হুমায়ূনের সাহিত্য-সাধনার অন্যতম প্রধান শক্তি ও বৈশিষ্ট্য। এ গল্প থেকে আমরা হুমায়ূনের শ্রেষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টির কৌশল উপলব্ধি করতে পারি। শুরু থেকে "আমি" চরিত্রটি জানত অসম্ভব, কিন্তু নিজেকে প্রতারিত করে, মাঝ পর্যায়ে সে ক্রমাগত আত্মভ্রান্তিতে ডুবে যায় এবং আশা বাড়িয়ে দেয়, শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর বাস্তবতার কাছে পরাজিত হয়। এভাবেই হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্ট প্রেমে পড়া এক যুবকের চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা খুবই নির্ভুল এবং হৃদয়বিদারক ছিল।

১.২ একটি নীল বোতাম-এর মনস্তাত্ত্বিক গঠন-কৌশল

১.২.১ চরিত্রের মানসিক অবস্থা ও অভ্যন্তরীণ মনোলোগের সমন্বয়

হুমায়ূন আহমেদ কেন্দ্রীয় চরিত্রের মানসিক পরিবর্তনগুলিকে বিভিন্ন দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শন করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে হীনমন্যতা, সংবেদনশীলতা, উদ্বেগ, রাগ, আশা এবং হতাশা। এশার বাবার সাথে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মিথস্ক্রিয়া তার হীনমন্যতা এবং ঘনিষ্ঠতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে; তার বন্ধুর রসিকতা তার রাগ এবং আত্মসম্মান প্রকাশ করে; আর এশার আমন্ত্রণ তার আনন্দ এবং তুচ্ছতার অনুভূতিকে চিত্রিত করে। এই বহু-কোণ বর্ণনা চরিত্রগুলিকে আরও ত্রিমাত্রিক এবং তাদের মানসিক অবস্থাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।

লেখক এশার বাবার নীল শার্টের প্রতি কেন্দ্রীয় চরিত্রের পর্যবেক্ষণ, বন্ধুর রসিকতার প্রতি তার রাগান্বিত প্রতিক্রিয়া এবং এশার আমন্ত্রণকে লালন করার মতো বিশদ বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারদর্শী। এই বিস্তারিত বর্ণনাগুলি কেন্দ্রীয় চরিত্রের অভ্যন্তরীণ অনুভূতিগুলিকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। একই সাথে, অভ্যন্তরীণ মনোলোগের ব্যবহারও খুব চতুর, যেমন এশাকে "তুমি" বলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভয় এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার কল্পনা, যা সরাসরি তার অভ্যন্তরীণ চিন্তাভাবনা উপস্থাপন করে এবং গল্পে সত্যতা এবং নিমজ্জনের অনুভূতি বৃদ্ধি করে।

১.২.২ বাস্তবতা এবং কল্পনার অন্তর্নিহিত মিলন, রূপক এবং প্রতীকের ব্যবহার

গল্পে, কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক কার্যকলাপ প্রায়শই বাস্তবতা এবং কল্পনার মধ্যে স্থির থাকে। একদিকে, সে স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে তার এবং এশার পরিবারের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে এবং বুঝতে পেরেছিল যে, সে এশার সঙ্গী হতে পারবে না; অন্যদিকে, তার মনে এখনও একটা কল্পনা ছিল যে, সে একদিন এশার মন জয় করতে পারবে। বাস্তবতা এবং কল্পনার এই মিশেলটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রামকে স্পষ্টভাবে দেখায়।

এই গল্পে "নীল বোতাম" একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপক হিসেবে কাজ করে, যা এশার প্রতি কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভালোবাসা এবং এশার কাছে পৌঁছানো অসম্ভব এই

বাস্তবতার প্রতীক। এটি কেবল কেন্দ্রীয় চরিত্রের সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং নিষ্ঠুর বাস্তবতাকেও বোঝায়। এই রূপকের ব্যবহার কেবল গল্পের বিষয়বস্তুকেই সমৃদ্ধ করে না, বরং কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পাঠকের ধারণাকেও গভীর করে।

১.২.৩ মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা, প্লট বিকাশে একীকরণ এবং আবেগীয় স্তরে পরিবর্তন

হুমায়ূনের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান নয়, বরং গল্পের বিকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনগুলি গল্পের বিকাশকে সমৃদ্ধ করে এবং গল্পের বিকাশ চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনাকে আরও গভীর করে। এই পারস্পরিক সম্পর্ক গল্পটিকে আরও সুসংহত করে এবং চরিত্রগুলিকে আরও স্বতন্ত্র করে তোলে।

হুমায়ূন কেন্দ্রীয় চরিত্রের আবেগের প্রগতিশীল স্তরগুলো দেখানোর জন্য সূক্ষ্ম বর্ণনা ব্যবহার করেছেন। শুরুতে হীনমন্যতা এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে মাঝখানে রাগ এবং আশা এবং শেষে হতাশা এবং গ্রহণযোগ্যতা পর্যন্ত, মানসিক পরিবর্তনগুলি স্বাভাবিক, মসৃণ এবং স্পষ্ট। আবেগের এই ধারাবাহিকতা কেবল গল্পের নাটকীয়তাকেই বাড়িয়ে তোলে না, বরং কেন্দ্রীয় চরিত্রের মানসিক পরিবর্তনগুলি পাঠককে আরও গভীরভাবে অনুভব করতে সক্ষম করে।

সংক্ষেপে, হুমায়ূন আহমেদের 'একটি নীল বোতাম' গল্পে বিভিন্ন ধরণের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা কৌশল ব্যবহার করেছেন যাতে তিনি বিশদ বর্ণনা, অভ্যন্তরীণ একক, রূপক এবং প্রতীকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় চরিত্রের জটিল অভ্যন্তরীণ জগৎকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তাঁর বর্ণনাগুলি কেবল সূক্ষ্ম এবং বিস্তারিত নয়, বরং সুগঠিত এবং আবেগের দিক থেকেও আন্তরিক, যা পাঠককে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনগুলি গভীরভাবে অনুভব করতে সক্ষম করে, যা তাঁর দুর্দান্ত সাহিত্য সৃষ্টির দক্ষতাকেও প্রতিফলিত করে।

২. একজন ক্রীতদাস

'একজন ক্রীতদাস' গল্পটিতে, "আমি" যেন প্রেমের ক্রীতদাস। সে ভাবে, আমার একজন মেয়েকে কাজী অফিসে বিয়ে করার কথা ছিল। কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থা খারাপ, তাই মেয়েটি অন্য ছেলেকে বাছাই করল। আমার কোনো উপায় না থাকায় নিজেকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিতে লাগলাম, নিজেকে নির্যাতন করতে লাগলাম।

২.১ গল্পের বিকাশের সাথে সাথে চরিত্রের মানসিক পরিবর্তন ঘটে

২.১.১ বিচ্ছেদের লক্ষণ ও আকস্মিক বিচ্ছেদ

গল্পের শুরুতে দেখা যায়, "আমি" চরিত্রটি তার দয়িতার জন্য অপেক্ষা করছে, নয়টার মধ্যে তার আসার কথা ছিল, তবে সে আসল না। "আমি" চরিত্রটি মনে মনে তাকে ফোন করতে চাইল, তবে সাহস পেল না। যখন সে ফোন করল, মেয়েটির গলা শুনে তার মন খুব বিহ্বল হয়ে গেল। তার সেই বিহ্বলতার কথা হুমায়ূন বর্ণনা করেছেন এভাবে, "পারুলের উৎফুল্ল সতেজ গলা শুনে আমি ভয়ানক অবাক হয়ে গেলাম। তোতলাতে তোতলাতে কোনোরকমে বললাম...।

তোমার ব্যবসার এখন যা অবস্থা বিয়ে করলে দুজনকেই একবেলা খেয়ে থাকতে হবে।... আঘাতটি আমার জন্যে খুব তীব্র ছিল।"[৯] বিয়ে ঠিক হবার পর

হুমায়ূন আহমেদের 'একজন ক্রীতদাস' গল্পের একটি গ্রাফিক চিত্র

পারুল তার ব্যবসার অবস্থাকে অবহেলা করল, সে তাকে প্রশ্ন করিনি, অভিশাপ দেইনি। তবে এই আঘাত তার জন্য খুব তীব্র ছিল, প্রায় গ্রহণ করতে পারল না।

২.১.২ প্রেমিকমনের আত্ম-প্রতারণা, আত্ম-ক্ষতি ও প্রাপ্তি

পরে "আমি" চরিত্রটি অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যায়। এখানে শুধু বলি "পারুলের সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেল।"[১০] সে তার হতাশা এবং দুঃখ উল্লেখ করেনি, তবে তার স্বর থেকে তার মনের অসহায়ত্ব স্পষ্ট দেখা যায়।

গতকালের অবস্থা উপেক্ষা করার পরও আজকের বাস্তবতা এত নিষ্ঠুর যে "আমি" চরিত্রটি ভাবে, তাকে জাগ্রত হতে হবে। "তার উজ্জ্বল চোখ, দ্রুত কথাবলার ভঙ্গি স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় জীবন অনেক অর্থবহ ও সুরভিত হয়ে হাত বাড়িয়েছে তার দিকে।"[১১] পারুলের সব ক্ষুদ্র স্মৃতি সে ভোলে না, সে তাকে খুব ভালবাসত।

পারুল তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর সে দিনের পর দিন খারাপ সময় কাটিয়েছে। "অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না।... তাতে সঞ্চিত টাকার সবটাই নষ্ট হয়ে গেল।... চাকর ছেলেটিকে ছাড়িয়ে দিতে হল।... এবং তারপরও আমাকে একদিন শুধু হাফ পাউন্ডের একটি পাউরুটি খেয়ে থাকতে হল।"[১২] তার শরীর এবং মানসিক অবস্থা খারাপ হয়, যেন সে নিজেকে শাস্তি দিল। পরে সে শহরকে ঘৃণা করল: "নিষ্ঠুর এবং অকরুণ এই শহরে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।" সে নিজেকে ঘৃণা করল, শহরকেও ঘৃণা করল। লেখক সাবলীলভাবে তার মনের অবস্থা বললেন, তবে পাঠক তার মনের ব্যথা অনুভব করতে পারে। "আমি" চরিত্রটি নিজেকে শাস্তি দিল, তার অবস্থা আরও খারাপ হল, তার জীবনে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। সে আসলে একজন ক্রীতদাস, প্রেমের ক্রীতদাস, পারুলের ক্রীতদাস, নিজের ক্রীতদাস। যে লোক তাকে যন্ত্রণা দিল সে লোক তো সে নিজেই। এমন বিশ্লেষণ শিরোনামের সঙ্গে খুব মানানসই।

সে পারুলকে কয়েক বার দেখল, তাকে চিনতে পারল। "পারুল যাতে আমাকে দেখতে না পায় সেইজন্যেই আমি সুঁট করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়লাম।"[১৩] সে বারবার জোর করলেও পারুল আর তার মনে জায়গা করতে পারেনি। তবে সে তার ব্যবহার দেখে তা বুঝতে পারে। যখন পারুলের মেয়েকে দেখল, একটি সুন্দর কল্পনা তার মনে এলো, "মাত্র এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল এই চমৎকার ডল-পুতুলের মতো মেয়েটি আমার হতে পারত।"[১৪] এটা তার মনের প্রকৃত আশা, তাই এত দিনের ব্যথা তার ভালবাসা পরিবর্তন করতে পারল না।

২.১.৩ ব্যক্তি মানুষ পরাজিত হয় এবং প্রেমের দাস নিজেকে হারায়

"আমি" চরিত্রটি বার বার নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, পারুল তাকে ভুলে গেছে, তবে "পারুল আশ্চর্য ও দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।... আমি অল্প হাসির ভঙ্গি করে হালকা সুরে বলতে চেষ্টা করলাম,...।"[১৫] যখন পারুল তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল, তখন তার মনে অনেক আবেগ, ভালবাসা, ঘৃণা, দুঃখ আসল। সে সাধারণভাবে কথা বলতে চেষ্টা করল, তবে মনের বড় দুঃখ ঢাকতে পারল না।

সে পারুলের চোখে জল দেখল। সে ভাবল, পারুল তার জন্য কাঁদল, আগের ভালবাসা আবার ফিরে এলো। হয়তো মনের ভালবাসা জেগে উঠল, সে নতুন করে এ ভালবাসা অনুভব করল। এত দিনে সে পারুলকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তবে সে আবার পারুলের ক্রীতদাস হল, সে সব সময় প্রেমের ক্রীতদাস।

হুমায়ূন এ গল্পটিতেও "আমি" ব্যবহার করে, সাবলীলভাবে নিষ্ঠুর কথা প্রকাশ করেছেন। এই গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র নিজেকে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে নিজেকে প্রতারিত করলো। গল্পের অক্ষরে আবেগ নেই, তবে পাঠকরা অক্ষর থেকে চরিত্রের মনের ব্যথা দেখতে পারে। স্বর এবং আবেগের মধ্য বড় তফাৎ আছে, এমন তফাৎ চরিত্রের ব্যথা বাড়িয়ে দেয়, এমন তফাৎ সরাসরি মনের ব্যথা প্রকাশ করার চেয়ে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে।

২.২ একজন ক্রীতদাস-এর মনস্তাত্ত্বিক গঠন কৌশল

২.২.১ সাবলীল বর্ণনা ও অভ্যন্তরীণ বেদনার মধ্যে আবেগের জটিল আন্তঃসম্পর্ক

গল্পটি বলার জন্য হুমায়ূন আহমেদ একটি সাবলীল বর্ণনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এই সাবলীলতার বিপরীতে কেন্দ্রীয় চরিত্রের হৃদয়ের গভীরের তীব্র বেদনা লুকিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেন্দ্রীয় চরিত্র পারুলের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তার পরিস্থিতি বর্ণনা করেন, তখন তার স্বর সাবলীল বলে মনে হয়, কিন্তু পাঠকরা তার অসহায়ত্ব এবং হতাশা অনুভব করতে পারেন। প্রশান্তি এবং বেদনার এই বৈপরীত্য পাঠকদের কেন্দ্রীয় চরিত্রের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণা আরও গভীরভাবে অনুভব করতে সাহায্য করে।

হুমায়ূন গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্রের জটিল আবেগগত সম্পর্ক দেখান, যার মধ্যে রয়েছে প্রেম, ঘৃণা, দুঃখ, ঈর্ষা ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেন্দ্রীয় চরিত্র পারুলের মেয়েকে দেখেন, তখন তিনি তার মেয়ের জন্য আকুলতা এবং পারুলের জন্য ভালোবাসা ও ঈর্ষাসহ বিভিন্ন আবেগের মিশ্রণ অনুভব করেন। আবেগের এই জটিল আন্তঃসম্পর্ক চরিত্রগুলিকে আরও ত্রিমাত্রিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনাকে আরও গভীর করে তোলে।

২.২.২ বিশদ বর্ণনা এবং মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার সমন্বয় এবং রূপক-প্রতীকের ব্যবহার

লেখক নাজুক বিবরণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মানসিক অবস্থাকে বোঝান। উদাহরণস্বরূপ, পারুলের কণ্ঠস্বর শুনে নায়কের হতবাক হওয়া, তার তোতলামি এবং পারুল চলে যাওয়ার পর তার কর্মকাণ্ড, যেমন নির্ঘুম রাত কাটানো, তার সমস্ত সঞ্চয় খরচ করে ফেলা এবং তার চাকরদের চাকরিচ্যুত করা, পারুলের প্রতি তার গভীর স্নেহ এবং তাকে হারানোর বেদনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। এই বিস্তারিত বর্ণনাগুলি কেবল গল্পের বাস্তবতাকেই বাড়িয়ে তোলে না, বরং পাঠকদের কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনগুলি আরও স্বজ্ঞাতভাবে অনুভব করতে সক্ষম করে।

গল্পে, কেন্দ্রীয় চরিত্র নিজেকে "ভালোবাসার দাস" হিসেবে বর্ণনা করেছেন, এটি প্রকৃতপক্ষে একটি রূপক যা প্রেমের প্রতি তার আবেগ এবং অসহায়ত্বকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। একই সাথে, সে পারুলের প্রতি তার ভালবাসাকে এক অনিবার্য বন্ধনের সাথে তুলনা করে, যা তার শক্তিহীনতা এবং ভালবাসার যন্ত্রণাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

২.২.৩ মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা প্লটের বিকাশ ও চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব

হুমায়ূনের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান নয় বরং গল্পের বিকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনগুলি গল্পের বিকাশকে উৎসাহিত করে এবং গল্পের বিকাশ চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনাকে আরও গভীর করে। উদাহরণস্বরূপ, পারুল চলে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় চরিত্রের আত্ম-নির্যাতন

কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ

প্রাবন্ধিক লু মেংকি

এবং পারুলের মেয়েকে দেখে তার আবেগঘন ক্ষোভ গল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং পাঠককে তার ভেতরের জগৎ আরও গভীরভাবে অনুভব করার সুযোগ দেয়। চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন গল্পের আবেদন আরও বাড়িয়ে তোলে। পাঠক কেন্দ্রীয় চরিত্রের বেদনা এবং সংগ্রাম আরও গভীরভাবে অনুভব করতে পারেন এবং গল্পটি পাঠকের হৃদয়কে আরও স্পর্শ করতে পারে।

'একজন ক্রীতদাস' গল্পে হুমায়ূন বিভিন্ন ধরণের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা কৌশল ব্যবহার করেছেন। তিনি সাবলীল বর্ণনা এবং অভ্যন্তরীণ বেদনার মধ্যে বৈপরীত্য, বিশদ বর্ণনা এবং মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, আবেগের জটিল অন্তর্নিহিতকরণ এবং রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় চরিত্রের জটিল অভ্যন্তরীণ জগৎকে প্রাণবন্তভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর বর্ণনাগুলি কেবল সূক্ষ্ম এবং বিস্তারিত নয়, বরং সুগঠিত এবং আবেগের দিক থেকেও আন্তরিক, যা পাঠককে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনগুলি গভীরভাবে অনুভব করতে সক্ষম করে, যা তার দুর্দান্ত সাহিত্য সৃষ্টির দক্ষতাকে প্রতিফলিত করে।

উপসংহার

হুমায়ূনের সাহিত্যকর্মে, মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা কৌশলের ব্যবহার পরিপূর্ণতার এক স্তরে পৌঁছেছে, যা 'একটি নীল বোতাম' এবং 'একজন ক্রীতদাস' গল্প দুটিতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। দুটি গল্পের চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনার গভীর বিশ্লেষণের

মাধ্যমে, আমরা চরিত্র গঠন এবং তার অন্তর্জগৎ প্রকাশে হুমায়ূনের অনন্য শৈল্পিক আকর্ষণের সারসংক্ষেপ করতে পারি।

এই দুটি গল্পে, হুমায়ূন চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তার গভীর বোধগম্যতা এবং অসাধারণ বর্ণনামূলক দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি চরিত্রগুলির অভ্যন্তরীণ জগৎকে বিশদ বর্ণনা, রূপক এবং প্রতীকের মাধ্যমে অত্যন্ত নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। একই সাথে, তিনি দক্ষতার সাথে সুর এবং আবেগের ব্যবধান ব্যবহার করে পাঠককে চরিত্রগুলির বেদনা এবং সংগ্রামকে আরও গভীরভাবে অনুভব করার সুযোগ দেন। এই মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা কৌশলটি কেবল গল্পের আবেদনই বাড়ায় না, বরং চরিত্রগুলিকে আরও ত্রিমাত্রিক এবং আবেগকে আরও আন্তরিক করে তোলে। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনার মাধ্যমে, হুমায়ূন সফলভাবে দুটি চরিত্র তৈরি করেছেন যারা প্রেমের সাথে লড়াই করছে, যারা একই রকম কিন্তু ভিন্ন। হুমায়ূনের বর্ণনামূলক দক্ষতা কেবল গল্পটিকে সমৃদ্ধ করে না, একই সাথে পাঠককে চরিত্রগুলির মানসিক ওঠানামা আরও গভীরভাবে অনুভব করতে সক্ষম করে। চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বের এই গভীর প্রকাশ হুমায়ূনের সাহিত্য-সাধনা এবং একজন অসাধারণ লেখক হিসেবে তাঁর শৈল্পিক কৃতিত্বকে প্রতিফলিত করে। তাঁর রচনাগুলি কেবল উচ্চ সাহিত্যিক মূল্যই নয়, বরং পাঠককে মানব প্রকৃতি এবং আবেগ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

তথ্যসূত্র

১ হুমায়ূন আহমেদ, *গল্প পঞ্চাশৎ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০০৯, পৃ.৭১
২ প্রাগুক্ত, পৃ.৭০
৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৭১
৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩
৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪
৬ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫
৭ প্রাগুক্ত
৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬
৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮
১০ প্রাগুক্ত
১১ প্রাগুক্ত
১২ প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯
১৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৯০
১৪ প্রাগুক্ত
১৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৯১

খণ্ড ১৯, সংখ্যা ২৩
Vol. 19, No. 23

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

জুন ২০২৫
June 2025

doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.5

ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

সংগীতনৃবিদ্যা : একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অধ্যায় নবম : সংগীতনৃতাত্ত্বিকদের কর্মপরিধি

তিমথি রাইস

অনুবাদ: নূরুননবী শান্ত

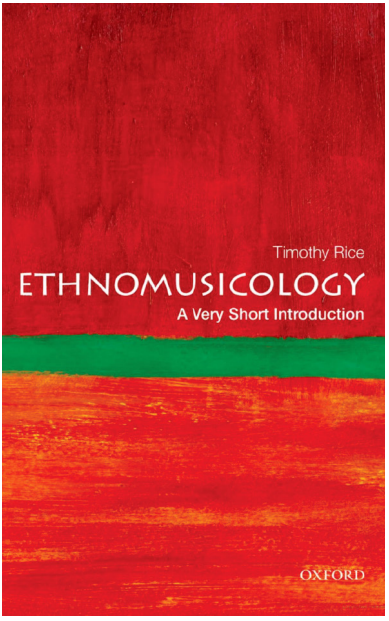

তিমথি রাইসের এথনোমিউজিকোলজি : এ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাক্শন *গ্রন্থের প্রচ্ছদ*

Tanslation from English

Ethnomusicology: A Very Short Introduction

Chapter 9 : Ethnomusicologists at Work

Timothy Rice

Translated by Nurunnabi Shato

Abstract

Ethnomusicologists navigate unique challenges in establishing their discipline within academic and institutional frameworks due to its focus on global music perspectives and ethical considerations. The 9th Chapter of *Ethnomusicology : A Very Short Introduction* written by Thimothy Rice explores the diverse institutional landscapes where ethnomusicologists work, from academia to public and private sectors. Despite historical challenges, ethnomusicology finds a home primarily within music departments and schools, where it challenges Eurocentric entrenched value systems that predominantly values European classical music. Beyond academia, ethnomusicologists contribute to K-12 education, governmental institutions, archives, and cultural industries. They curate festivals, manage sound archives, and contribute to policy-making, exhibiting the breadth of their impact. Public service and applied ethnomusicology play significant roles, addressing social issues through music and fostering intergroup relations. The essay emphasizes the evolving nature of ethnomusicology, its relevance in modern contexts, and the enduring need for its interdisciplinary and global perspective in understanding human musical expression.

একাডেমিক বিষয়সমূহের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একাডেমিক বিষয়কে স্রেফ একাডেমিক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা এবং বিজ্ঞান ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমর্থিত নির্দিষ্ট ডোমেইনে বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন সম্পর্কিত বিষয়সমূহই একাডেমিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত। এ ক্ষেত্রে সংগীতনৃবিদ্যা কিছুটা ভিন্ন বিষয়। একে সবসময়ই সংগীত বিভাগের এক প্রান্তিক বিষয় হিসেবে দেখা হয়েছে, এবং সংগীতনৃবিদ্যা যেন সংগ্রাম করে চলেছে মাস্টারদের টেবিলে স্বতন্ত্র স্থান পাবার জন্য। অন্যদিকে, সংগীতনৃবিজ্ঞানীরা যেহেতু মানুষের সঙ্গে কাজ করেন, সুতরাং গবেষণার মানুষদের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা এবং সেই মানুষদের উপর তাদের কাজের নৈতিক প্রভাব সম্পর্কে তাদেরকে পূর্ণ সচেতন থাকতে হয়। অতএব, সংগীতনৃবিজ্ঞানীরা কোথায় কোন ধরনের কাজ করছেন সে প্রশ্ন দীর্ঘকালব্যাপী তাদের গবেষণাক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে আছে।

একাডেমিক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য সংগীতনৃবিদ্যাকে সংশ্লিষ্ট সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের সমর্থন আদায় করতে হবে। সমাজ ও প্রতিষ্ঠান যদি উপলব্ধি করে যে একাডেমিক বিষয় হিসেবে এর সম্ভাব্য মূল্য রয়েছে, তাহলেই সংগীতনৃবিদ্যা স্বতন্ত্র একাডেমিক বিষয় হিসেবে অনুমোদন পাবে। এই বিষয়ের সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতদের নতুন আবিষ্কৃত জ্ঞান যেন সমাজে নিশ্চিত অবদান রাখতে পারে, তা সমাজে চর্চিত জ্ঞানের বিমূর্ত সংযোজন হিসেবেই হোক অথবা সমাজের সমস্যা সমাধানের প্রায়োগিক বিষয় হিসেবে হোক। সংগীতনৃবিদ্যার প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন পাওয়া কিছুটা সমস্যাসংকুল। কারণ, এটি সংগীতের বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণের পক্ষে কথা বলে এবং সকল সংগীতের সমান মানবিক মূল্যে বিশ্বাস করে। এভাবে এটি ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা সমর্থিত ব্যাপক পরিসরের ধারণাসমূহকে চ্যালেঞ্জ করে। ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানগুলো সেইসব সংগীতকেই মূল্যায়িত করে যেগুলো সংজ্ঞায়িত করা হয় ইউরোপীয়ান আর্ট মিউজিকের কথিত শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডে অথবা বাণিজ্যিক সম্ভাবনার নিরিখে। এই প্রেক্ষাপটে, সংগীতনৃবিদ্যার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে এ প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে যে, সংগীতনৃবিদ্যাকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান সমর্থন করে এবং সংগীতনৃবিজ্ঞানীরা কোথায় কাজ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন

সংগীতনৃবিদ্যার প্রবক্তাগণ অনেক আগে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান মিউজিকোলজিক্যাল সোসাইটি অথবা আমেরিকান অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের অধীনতা থেকে বেরিয়ে সংগীতনৃবিদ্যার নতুন সংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরই একটি নতুন শক্তিশালী অধ্যয়ন শাস্ত্র হিসেবে সংগীতনৃবিদ্যার প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছিল। নতুন নাম এবং পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রসমূহ থেকে স্পষ্ট ভিন্নতা নিয়ে সংগীতনৃবিদ্যা ইংরেজি মাধ্যমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা করে নিতে শুরু থেকেই কঠোর সংগ্রাম করেছে।

বহু বছরের পরিক্রমায় সংগীতের নৃবিদ্যা নামে বর্ণিত এই অধ্যয়ন শাস্ত্র বিকশিত হলেও নৃবিদ্যা বিভাগসমূহে স্বতন্ত্র একটি স্থান পেতে ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়েছে, সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া: ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যালান মেরিয়াম কিছু শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন; এবং বেলফাস্টের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে জন ব্ল্যাকিং একটি প্রোগ্রাম চালু করেছিলেন। মার্টিন স্টোকস এই পরিস্থিতির পেছনে একটি যৌক্তিক কারণ অনুমান করেছেন:

> পূর্ববর্তী সংগীতবিদ্যায় কথিত ব্যাপক পরিব্যাপ্ত বয়ান অনুসারে, [নৃতত্ত্ববিদরা] সংগীতকে এখনও এক বিশেষ, অতি-সামাজিক, অটোনমাস অভিজ্ঞতার ডোমেইন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সংগীতনৃতাত্ত্বিকরা সমাজস্থিত যেসব বিষয় অধ্যয়ন করেন, তা—নৃতত্ত্ববিদদের এক অংশের মতে—অপ্রাসঙ্গিক অথবা রহস্যময়। সংজ্ঞাগতভাবে এইসব বিষয় সামাজিক বাস্তবতার অনুমিত উপাদানসমূহের প্রধান প্রধান বাচনিক ও দৃষ্টিগোচর "বাস্তব জীবন" গঠনকারী কার্যক্রম ও কার্য প্রক্রিয়ার বিভিন্নতা নিয়ে কাজ করতে পারে না।

সংগীতনৃবিদ্যাকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি স্বাগত জানিয়েছে সংগীত বিভাগ ও সংগীত স্কুলগুলো। ঐতিহাসিকভাবে, এই প্রতিষ্ঠানসমূহ ইউরোপিয়ান আর্ট মিউজিকের উপর বৃত্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদানেই নিবিষ্ট ছিল, তবে সময়ের পরিক্রমায় কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের পরিসর সম্প্রসারিত করে জ্যাজ, জনপ্রিয় সংগীত এবং বিশ্বসংগীতের কয়েকটি কোর্স চালু করেছিল। এমনকি এরকম কিছু ব্যতিক্রমী অনুকূল প্রেক্ষাপটেও, সংগীতনৃতাত্ত্বিকদের এমন এক অপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত ভিত্তিক উদ্দেশ্যমূলক অভেদ্য ভেল্যু সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে যেখানে ইউরোপিয়ান আর্ট মিউজিককে উচ্চতর মনে করা হয় এবং অন্য যেকোনো সংগীতের চেয়ে ইউরোপিয়ান আর্ট মিউজিক অধ্যয়ন অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয়; মনে করা হয় যে, ইউরোপিয়ান আর্ট মিউজিকের শিল্পী, কলাকুশলী, পৃষ্ঠপোষক ও গবেষকরা অপরাপর ধারার সংগীত শিল্পী, কলাকুশলী, পৃষ্ঠপোষক ও গবেষকদের চেয়ে উচ্চ শ্রেণির। সংগীত বিদ্যালয়গুলোতে প্রত্যাশা করা হয়, সংগীতনৃতাত্ত্বিকরা "বিশ্বের সংগীত সংস্কৃতি" এবং এ জাতীয় নামের কোর্সগুলোতে মূলত বিশ্বসংগীত শেখাবেন। এটা এমন এক প্রবণতা যা সংগীতনৃবিদ্যা "অধ্যয়নের উদ্দেশ্য" সংকীর্ণভাবে উপস্থাপন করে। এই বাতাবরণে থেকেও, তারা (সংগীতনৃবিজ্ঞানীরা) হয়তো সেইসব মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারে অবদান রাখতে পারবে বলে

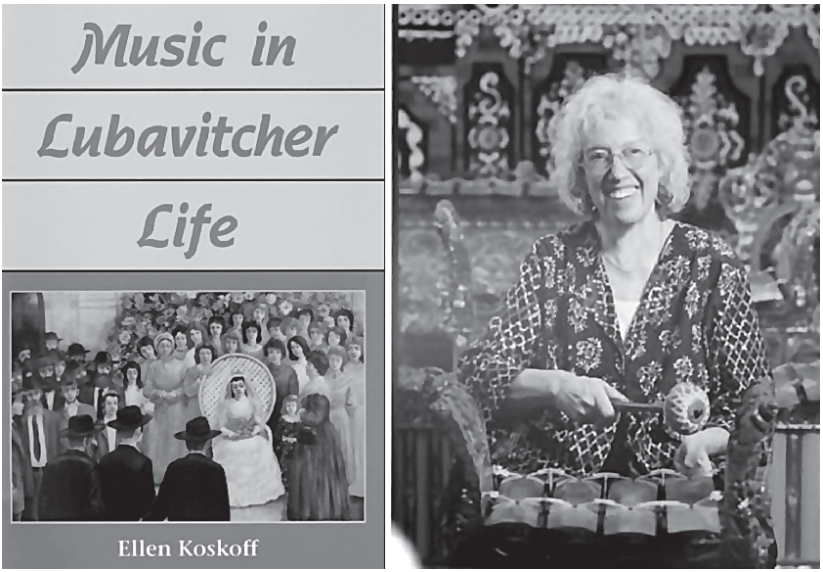

সংগীতনৃতাত্ত্বিক এলেন কোসকফ এবং তাঁর গ্রন্থের প্রচ্ছদ

আশা করে যে, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলো বেশিরভাগ সংগীত বিভাগ ও স্কুলের বর্জনমূলক (exclusionary) নন্দনতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র মোকাবিলা করতে সক্ষম। এলেন কোসকফ (Ellen Koskoff) এ প্রসঙ্গে বলেন, সংগীতনৃতাত্ত্বিকগণ একটি "বেডরক ফিলসোফি" [দৃঢ় মৌলিক দর্শন, যার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট বিদ্যা বা শাস্ত্র বিকশিত হয়] শেখান। সংগীতনৃতাত্ত্বিকদের "বেডরক ফিলসোফি" এটাই যে, "কারো না কারো কাছে, কোথাও না কোথাও, সব সংগীত এবং সব মানুষ সমমানের (এবং মূল্য বা মান)।" তারা শিক্ষার্থীদেরকে "পৃথিবীর যথাযথ সংগীতময় নাগরিক হতে" শেখান এবং "সব ধরনের ভিন্নতাকে সংস্কারমুক্ত মন, ন্যায্যতা ও সহানুভূতি দিয়ে দেখার চোখ" অর্জন করতে বলেন।

কোনো কোনো সংগীত বিভাগ ও স্কুলে সংগীত নৃতাত্ত্বিকদের পাঠদান করা কোর্সসমূহ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করার কারণে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা আরও অধিক সংগীতনৃতাত্ত্বিক যুক্ত করা শুরু হয় যাতে ডক্টরাল প্রোগ্রাম চালু করা যায়। বর্তমানে (২০১৪) আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সংগীতনৃবিদ্যায় বিশটি ডক্টরাল প্রোগ্রাম রয়েছে। গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডে রয়েছে দশ থেকে বিশটি ডক্টরাল প্রোগাম। এমনকি যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে সংগীতনৃবিদ্যা চালু হয়েছে সেখানেও সংগীতশাস্ত্রের আন্ডারগ্রাজুয়েটরা তাদের সংগীতসংশ্লিষ্ট কর্মজীবনে যে সুবিস্তৃত সংগীত পরিসরের মুখোমুখি নিশ্চিতভাবেই হবে সে বিষয়ে তাদের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে এবং সাম্যবাদী ও বৈশ্বিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে সংগীতনৃতত্ত্ববিদদের আরও কঠিন লড়াই করতেই হবে।

সরকারি ও বেসরকারি খাত

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো ছাড়াও আজকের সংগীতনৃবিজ্ঞানীরা অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। যেমন, কে-১২ স্কুল (যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও আরও কিছু দেশে এ ধরনের স্কুলে কিন্ডারগার্টেন স্তর থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়) এবং আর্কাইভের মতো বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, ও জাদুঘর; নানা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (যুক্তরাষ্ট্রে), যথা, ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর আর্টস, ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর হিউম্যানিটিজ, লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন, গণসম্প্রচার প্রতিষ্ঠান (public broadcasting), রাজ্য ও স্থানীয় ফোক আর্ট এজেন্সি আর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তাদের কর্মক্ষেত্র। এমনকি সংগীত, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতেও সংগীতনৃবিজ্ঞানীদের কাজে লাগে, বিশেষ করে মেধা সম্পদ অধিকার, লাইসেন্সিং, এবং গবেষণা সংক্রান্ত কাজে।

কিছু সংগীতনৃতাত্ত্বিক কে-১২ স্কুলে সংগীত শিক্ষাদানের কাজে যোগদান ক'রে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের শিক্ষকদের প্রশিক্ষক হিসেবে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়েছেন। প্যাট্রিসিয়া ক্যাম্পবেল সংগীতনৃতাত্ত্বিক থিমসমূহের মধ্যে কয়েকটিকে সংগীত শিক্ষকদের জন্য বিশেষভাবে ফলপ্রসূ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো হলো সংগীত উপলব্ধির আন্তঃসাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ; মন—শরীর ও সংগীত—নৃত্য দ্বৈততা; শিশুদের সংগীত সংস্কৃতি; বিশ্বসংগীত শিক্ষাবিজ্ঞান (pedagogy of world music); এবং সংগীত চিন্তা ও সংগীত আচরণ অধ্যয়নের পদ্ধতি। প্রায়ই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সংগীতনৃবিজ্ঞানীদের আহ্বান জানানো হয়। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯৯৮ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট অফ আর্টসের (এনইএ) চেয়ার হয়েছিলেন বিল আইভে (Bill Ivey); উইলিয়াম ফেরিসকে (William Ferris) ১৯৯৭ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট অফ হিউম্যানিটিজের (এনইএইচ) চেয়ার করা হয়েছিল; বেস লোম্যাক্স হাউস এবং ড্যানিয়েল শেহি ছিলেন এনইএ-এর ফোক আর্ট প্রোগামের প্রধান; এবং রবার্ট গারফিয়াস দায়িত্ব পেয়েছিলেন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ দ্য আর্টসের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করার। আমেরিকান সংগীত ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ আধার লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের আমেরিকান ফোকলাইফ সেন্টারের বোর্ড অফ ট্রাস্টি এবং কর্মী হিসেবে সংগীতনৃবিজ্ঞানীদের নিযুক্ত করা হয়। ১৯৮৭ সালে স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশন 'ফোকওয়েস রেকর্ডস' অধিগ্রহণ করে, যা কেবল আমেরিকান ফোক ও ব্লুজ শিল্পীদেরই রেকর্ডিং অগ্রদূত নয়, বিশ্বসংগীতেরও রেকর্ডিং অগ্রদূত। সংগীতনৃবিজ্ঞানী অ্যান্থনি সিগার ইন্সটিটিইশনের প্রথম পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন ১৯৮৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত। তিনি এবং তাঁর উত্তরসূরিগণ ফোকওয়েস রেকর্ডসকে সারাবিশ্ব থেকে সংগ্রহ করা সংগীতের নেতৃস্থানীয় রেকর্ডিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের রেকর্ডিংগুলো বিস্তৃত এবং প্রামাণ্য নোটে সমৃদ্ধ। তারা ঐতিহ্যগত সংগীত শিল্পীদের জন্য সম্মানী ও রয়্যালটি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেন। এর পূর্বে এই ধরনের শিল্পীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানের বিষয়টি উপেক্ষিত ছিল।

পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সাউন্ড আর্কাইভ ভিয়েনা ফোনোগ্রামার্কাইভে সংরক্ষিত ছবি

সংগীতনৃবিজ্ঞানীদের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র সাউন্ড আর্কাইভ। ফোনোগ্রাফ রেকর্ডিংয়ের প্রথম দিন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সংগীতনৃবিজ্ঞনীরা তাদের ফিল্ড ওয়ার্ক রেকর্ডিং আর্কাইভে জমা করছেন, এবং অনেকেই সাউন্ড আর্কাইভে কর্মসংস্থানও করে নিয়েছেন। প্রথম সাউন্ড আর্কাইভ ছিল ১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ভিয়েনা ফোনোগ্রামার্কাইভ (Vienna Phonogrammarchiv) এবং এরিক ভন হর্নবোসেল (Erich von Hornbostel) ১৯০৫ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত পরিচালনা করেছেন বার্লিনার ফনোগ্রামার্কাইভ (Berliner Phonogramm-Archiv)। বর্তমানে সুবিশাল আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালারসমূহের মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ লাইব্রেরি সাউন্ড আর্কাইভ, লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের আমেরিকান ফোকলাইফ সেন্টার, এবং ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি আর্কাইভস অফ ট্রাডিশনাল মিউজিক। আরো কিছু জাতীয় আর্কাইভ, যেমন, ভারতের আর্কাইভ এন্ড রিসার্চ সেন্টার ফর এথনোমিউজিকোলজি, অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ফিল্ম এন্ড সাউন্ড আর্কাইভ, এবং কানাডিয়ান মিউজিয়াম অফ সিভিলাইজেশন আর্কাইভ স্থানীয় সংগীতময় ঐতিহ্যের রেকর্ড সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বড় আন্তর্জাতিক বা ছোট স্থানীয় সাউন্ড আর্কাইভ উভয় স্থলে কাজ করতে গিয়ে সংগীতনৃবিজ্ঞানীরা ব্যাপক নৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হন। যেমন, কয়েক দশক আগে যেসব শিল্পীর গান রেকর্ড এবং সংরক্ষণ করা হয়েছিল, তাদের বংশধররা সেই গানগুলো জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের বৈধতা এবং প্রচারের ধরন নিয়ে নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন; অথবা যে কমিউনিটিতে বা পরিবারে গানগুলি রেকর্ড করা হয়েছিল সেই কমিউনিটি বা পরিবারের উত্তরসূরিরা সেগুলো ফেরত চাইতে

ওয়াশিংটন ডিসির ন্যাশনাল মলে অনুষ্ঠিত ২০০৯ সালের স্মিথসোনিয়ান ফোকলাইফ ফেস্টিভাল উপলক্ষে আয়োজিত ল্যাটিন আমেরিকার পরকাশন বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক 'তুলনামূলক কর্মশালা'র অংশ হিসেবে সংগীতনৃতত্ত্ববিদ ড্যানিয়েল শিহি (Daniel Sheehy) কলাম্বিয়ান গুয়াচারচ বা র‍্যাস্প [guacharaca (rasp)] বাদক জাইমে মায়েস্ত্রের (Jaime Maestre) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

পারেন। সংগীতনৃবিজ্ঞানীদের প্রায়ই আহ্বান জানানো হয় তাদের গবেষণাক্ষেত্রের সংগীতময় সংস্কৃতির প্রতিনিধিদের নিয়ে বা তাদের বিবেচনা অনুসারে নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ সংগীত শিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে কনসার্ট ও ফেস্টিভাল আয়োজন, প্রযোজনা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য। সংগীত শিল্পী, স্পন্সরদের পাবলিক পলিসি এজেন্ডা এবং সাধারণ জনগণের জন্য সংগীতনৃবিজ্ঞানীরা যে শত শত ফেস্টিভাল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হলো ওয়াশিংটন ডিসির মলে আয়োজিত বাৎসরিক স্মিথসোনিয়ান ফোকলাইফ ফেস্টিভাল। কিছু সংগীতনৃতত্ত্ববিদ কাজ করেন বাণিজ্যিক সংগীত ও চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে। সেখানে তারা বিশেষ করে অনলাইন এনসাইক্লোনপিডিয়া, ফিল্ম স্কোর [নির্দিষ্ট চলচ্চিত্রের জন্য উপযুক্ত সংগীত নির্বাচন, তৈরি ও ব্যবহার করা], গেমস-এ ব্যবহার করার প্রয়োজনে উপযুক্ত সংগীত বাছাই করার জন্য গবেষণা করা, সংগীত নির্বাচন করা এবং নির্বাচিত সংগীতের লাইসেন্সিংয়ের কাজ করে থাকেন। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে এক ব্যতিক্রমী উদাহরণের সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৯ সালের ব্লকবাস্টার ত্রিমাত্রিক চলচ্চিত্র "অ্যাভ্যাটার"-এ প্যান্ডোরা গ্রহের না'ভি মানুষদের (Na'vi people) নতুন "সংগীতময় সংস্কৃতি" প্রতিফলিত করার প্রয়োজনে লেখক ও পরিচালক জেমস ক্যামেরুন এবং সংগীত পরিচালক জেমস হর্নারকে সহায়তা করেছেন সংগীতনৃবিজ্ঞানী ওয়ান্ডা ব্রায়ান্ট।

এই কাজ করতে গিয়ে ব্রায়ান্ট সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত রেকর্ডিং সংগ্রহ করে সংগীত পরিচালককে প্রদান করেন পর্যালোচনার জন্য; নতুন করে সৃষ্টি

করা না'ভি ভাষায় গান রেকর্ড করার জন্য লস এঞ্জেলেস অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন "আদিবাসী" গোষ্ঠীর শিল্পীদের নিয়ে আসেন; এবং সৃষ্টি করেন কাল্পনিক না'ভি সংস্কৃতি যেখানে প্রচলিত রয়েছে হান্ট সং (শিকার সংগীত), ফিউনারেল লেমেন্ট (মৃত্যু বিলাপ), এবং উইভিং সং (তাঁতের গান) ধরনের সংগীত ধারা। হর্নার এই সংগীতসমূহ গ্রহণ করেন, এগুলোকে সংশ্লেষিত, সংমিশ্রিত করার মাধ্যমে সমন্বিত ও বহুলাংশে এক অচেনা সুর সৃষ্টি করেন। নতুন এই না'ভি সংগীতকে ঐতিহ্যবাহী হলিউড অর্কেস্ট্রাল স্কোর ১০-এর (ক্লাসিক হালিউড চলচ্চিত্রের সংগীত শৈলী। হৃদয়স্পর্শী ইতিবাচত আবেগীয় মুহূর্ত উপস্থাপন করতে এই ধারার সিনেমাটিক সংগীত ব্যবহার করা হয়) অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

সরকারি চাকুরি

সংগীতনৃতত্ত্ববিদরা কোনো না কোনো সরকারি চাকুরিতেও (যুক্তরাষ্ট্রে) নিয়োজিত হতে পারেন। সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত হবার শুরুতেই তারা প্রতিদান দিতে চান তাদেরকে যারা তাদের ক্ষেত্রগবেষণার কাজে পরামর্শক হিসেবে আতিথিয়েতা ও সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। রেকর্ডিং তৈরি করতে, "রেকর্ড জ্যাকেট"-এর নোট লিখতে এবং কনসার্ট আয়োজন করতে গিয়ে যে সংগীত শিল্পীদের সংগে সংগীতনৃবিজ্ঞানীদের বন্ধুত্ব তৈরি হয় সরকারি কর্মচারি হবার পর তাদের পাশে তারা থাকেন। যেহেতু তারা বিশ্বাস করেন যে যেকোনো সংগীত ঐতিহ্য বৃহত্তর পরিসরে স্বীকৃতি দাবি করে, তাই তারা তাদের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে ঐতিহ্যবাহী সংগীতের প্রচারণা চালাতে থাকেন। অনেক সময় তারা ঐতিহ্যবাহী সংগীত অনুবাদ করার মাধ্যমে বা ঐতিহ্যবাহী সংগীত শিল্পীদের বিশ্ব ভ্রমণের সুযোগ প্রদান করার মাধ্যমে তাদের সুনাম ও সৌভাগ্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। কেউ কেউ এই প্রণোদনামূলক কাজকে জনসেবার প্রতি নিবেদন হিসেবে অথবা গভীর তাৎপর্যময় পরিস্থিতিতে আন্তঃগোষ্ঠীগত সম্পর্কের মান উন্নয়নে নিবেদিত "প্রায়োগিক সংগীতনৃবিদ্যা"; বিপন্ন সংগীতময় সংস্কৃতি সুরক্ষার পদক্ষেপ; কিংবা পৃথিবীতে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের স্বপ্ন পূরণে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও ঐতিহ্যবাহী সংগীত শিল্পীদের সহায়তা করা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভেনিয়ার সভানিবর পেটান (Svanibor Pettan), ব্রাজিলের স্যামুয়েল আরাউজো, অস্ট্রিয়ার উরসুলা হেমেটেক ও বেস লোম্যাক্স, এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাউস (Hawes), ডেনিয়েল শিহি ও অ্যান্থনি সিগার এ ধরনের কাজে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ভূমিকা পালন করেছেন। জার্মানিতে রোমানিয়া থেকে আগত রোমা অভিবাসী ও ভিয়েতনামী অতিথি শ্রমিকদের উপর নব্য-নাৎসি স্কিনহেডদের সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সংগীতনৃবিজ্ঞানী ব্রিটা সুইয়ার্স (Britta Sweers) আন্তঃজাতিগত সহিষ্ণুতা ও "সাংস্কৃতিক ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য" (polyphony of cultures) বিষয়ে স্কুল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য সংগীতের এক সিডি তৈরিতে সহায়তা করেছিলেন। ক্যাথেরিন ভ্যান বুরেন, গ্রেগরি বার্জ এবং আরও কয়েকজন সংগীতনৃবিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন এইচআইভি/এইডস এর ভয়াবহ সংক্রমণ সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষিত করতে সংগীতের ভূমিকা বিষয়ে। পৃথিবীর বহু এলাকায়, বিশেষ করে আফ্রিকায়, স্থানীয় অ্যাক্টিভিস্ট ও সংগঠকদের তারা সহায়তা প্রদান করেছেন সংগীত ব্যবহার করে তৃণমূল পর্যায়ের ভয়াল স্বাস্থ্য

সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য সাধনে। একইসঙ্গে তারা তাদের কার্যক্রমের ডকুমেন্টেশন করেছেন এবং সংগীত পদক্ষেপের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করেছেন।

বিশ বছর আগে (১৯৯০-এর দশকের প্রথমার্ধে) সংগীতনৃবিদ্যাকে কেবলই বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক বিদ্যা মনে করা হতো এবং জনপ্রশাসন খাতে, প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বা বাস্তব সমস্যা সমাধানে এই বিদ্যা কোনো কাজে আসবে কি না তা নিয়ে উদ্বেগ ছিল। আজকে যখন সংগীতনৃবিজ্ঞানীরা মানুষ ও সমাজের গুরুতর সামাজিক, স্বাস্থ্যগত ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে ক্রমেই বেশি বেশি নিযুক্ত হচ্ছেন, সেই দ্বিধা (dichotomy) দ্রুতই লোপ পাচ্ছে। অ্যান্থনি সিগারের ভাষায়, "কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্যতার অগ্নিপরীক্ষায় (সংগীতনৃবিদ্যা) তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে" (theories forged in the crucible of action)।

সংগীতনৃবিজ্ঞানীরা ক্রমবর্ধমানভাবে নিজেদের প্রশ্ন করে চলেছেন, "সংগীতনৃবিদ্যার উদ্দেশ্য কি?" এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর অনেক। উদাহরণস্বরূপ, একাডেমিক পরিসরে সংগীতনৃবিজ্ঞানীরা সকল সময় ও স্থানে মানুষের সংগীত সৃষ্টিশীলতা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে অসংখ্য গল্প বলে যাচ্ছেন। তাদের গল্পগুলি সংগীতগত মূল্যবোধ ও ভাণ্ডার সম্পর্কিত চরম সংকীর্ণ, গভীর ঘেরাটোপে সীমাবদ্ধ, সমালোচনাহীনভাবে গৃহীত ও প্রশংসিত ইউরোসেন্ট্রিক ধারণাসমৃদ্ধ অপরাপর গল্পগুলিকে চ্যালেঞ্জ করছে। সংগীতনৃবিজ্ঞানীদের গল্পগুলি সংগীতের প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধির জগৎ সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের সংগীত চর্চার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে।

সংগীতনৃবিজ্ঞানী ও লেখক তিমথি রাইচ

অনুবাদক নূরুননবী শান্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিশেষ করে সংগীতনৃবিজ্ঞানীরা যখন যুদ্ধ, সহিংসতা, সামাজিক অসমতা বা মহামারী আক্রান্ত এলাকায় কাজ করেন, তারা চেষ্টা করেন প্রাসঙ্গিক ও কার্যকরি গবেষণা পরিচালনা করতে, চেষ্টা করেন কিছু ক্ষেত্রে মানুষের জীবন-মান উন্নয়নে অবদান রাখতে। জন ব্ল্যাকিং এর আলঙ্কারিক কথায়:

> সংগীতনৃবিদ্যা বিশ্বে প্রভাবশালী বিদ্যা হতে পারে, যদি তা পথ দেখাতে পারে পরিবেশনা শিল্পের প্রয়োগের মাধ্যমে মানব জীবনের বাস্তব শক্তিশালী দিকগুলো আলোকিত করার, রাজনৈতিকভাবে দুর্বলদের শক্তি বৃদ্ধি করার, সব মানুষের আবেগীয় অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার, এবং সফল সংগীত পরিবেশনার মতোই সুখি জীবন যাপনের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ পারস্পারিক সম্পর্ক সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করার।

আজকের সংগীতনৃবিজ্ঞানীরা সংগীত জগতের সাথে সম্পৃক্ত হন সংগীতের স্বরূপ স্বীকার করে নিয়ে, সংগীত কেমন হওয়া উচিত সে বিবেচনা নিয়ে ঐতিহ্যবাহী সংগীতের সংগে সম্পৃক্ত হন না। যদিও সংগীতনৃতত্ত্বের প্রারম্ভিক প্রজন্ম কাজ শুরু করেছিলেন ঐতিহ্যবাহী সংগীতের গভীর ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যগুণের নিরিখে, এবং উপেক্ষা করেছিলেন নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট নতুন ধরনের সংগীতকে, আজকের সংগীতনৃবিজ্ঞানীরা সারা বিশ্বের জনপ্রিয় ও উদীয়মান সংগীতধারা এবং একই সঙ্গে সংগীত শিল্পী, শ্রোতা, প্রযোজক এবং সরকারি, ধর্মীয় ও বেসরককারি প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলো কীভাবে ব্যবহার করে, তা নিয়ে গবেষণা করেন এবং লেখেন।

ঐতিহ্যবাহী সংগীত অধ্যয়নের মাধ্যমে সংগীতনৃজ্ঞিানীরা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক জীবনে সংগীতের প্রায়োগিক গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। এভাবে তারা সংগীতের স্বভাব সম্পর্কিত যেসব উপলব্ধি অর্জন করেছেন সেগুলোই সংগীতনৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। বিশ্বজুড়ে সংগীতের নতুন নতুন ধারার আধুনিক ও উত্তরাধুনিক বিস্ফোরণ দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তির বিকাশ এবং আধুনিক বিশ্বের বিপুল মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় রত দ্রুত পরিবর্তনশীল, বিলীয়মান, ও পুনর্বিন্যস্ত সমাজ ব্যাখ্যা করে। পূর্বাভাসিত "ধূসরায়িত" সংগীতময়তা নিয়ে গলদঘর্ম হবার বদলে সংগীতনৃতাত্ত্বিকরা চেষ্টা করছেন পুরোনো, নতুন ও উদীয়মান সংগীতের দৃশ্যমানতা ও ধারার সঙ্গে তাল রেখে কাজ করতে যা সংগীত সৃষ্টি ও সংগীতময় হবার মাধ্যমে নিজেদের কথা বলা ও বোঝার জন্য মানবজাতির চিরায়ত প্রচেষ্টার গল্প বলে। মোটকথা, করার মতো কাজ সংগীতনৃবিজ্ঞানীদের সবসময়ই থাকবে।

References

Patricia S. Campbell, "Ethnomusicology and Music Education: Crossroads for Knowing Music, Education, and Culture," *Research Studies in Music Education* 21 (2003):16–30.

Ellen Koskoff, "What Do We Want to Teach Them When We Teach Music? One Apology, Two Short Ripostes, Three Ethical Dilemmas, and Eighty-two Questions," in *Rethinking Music*, ed. Nicholas Cook and Mark Everist (Oxford: Oxford University Press, 1999), quote from 558–59.

Sylvia Nannyonga-Tamusuza and Andrew N. Weintraub, "The Audible Future: Reimagining theRole of Sound Archives and Sound Repatriation in Uganda," *Ethnomusicology* 56, no. 2 (2012): 206–33.

Helen Rees, "The Dongjing Music Revival: Have Music, Will Travel," in *Echoes of History: Naxi Music in Modern China* (New York: Oxford University Press, 2000).

Victoria Rogers, "John Blacking: Social and Political Activist," *Ethnomusicology* 56, no. 1 (2012): 63–85, quote from 80.

Anthony Seeger, "Theories Forged in the Crucible of Action," in *Shadows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology*, ed. Gregory Barz and Timothy J. Cooley, 271–88, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 2008).

Martin Stokes, "Introduction: Ethnicity, Identity and Music," in *Ethnicity, Identity, and Music: The Musical Construction of Place*, ed. Martin Stokes, 1–27 (New York: Berg, 1994), quote from 1.

Britta Sweers, "Polyphony of Cultures: Conceptualization and Consequences of an Applied Media Project," in *Applied Ethnomusicology: Historical and Contemporary Approaches*, ed. Klisala Harrison et al., 214–32 (Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars, 2010).

Katherine J. Van Buren, "Applied Ethnomusicology and HIV and AIDS: Responsibility, Ability, and Action," *Ethnomusicology* 54, no. 2 (2010): 202–23.

Further Reading

Schippers, Huib. *Facing the Music: Shaping Music Education from a Global Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Sheehy, Daniel. "A Few Notions about Philosophy and Strategy in Applied Ethnomusicology." *Ethnomusicology* 36, no. 3 (1992): 323–36.

Listening

Avatar: Music from the Motion Picture. CD, Atlantic Records.

Avatar: Extended Collector's Edition. DVD, Twentieth-Century Fox Film Corporation.

খণ্ড ১৯, সংখ্যা ২৩
Vol. 19, No. 23

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

জুন ২০২৫
June 2025

doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.6

বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ

চিলেকোঠার সেপাই : ত্রয়োদশ অধ্যায়

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

অনুবাদ : ম্যাথিউ ডি. রিচ

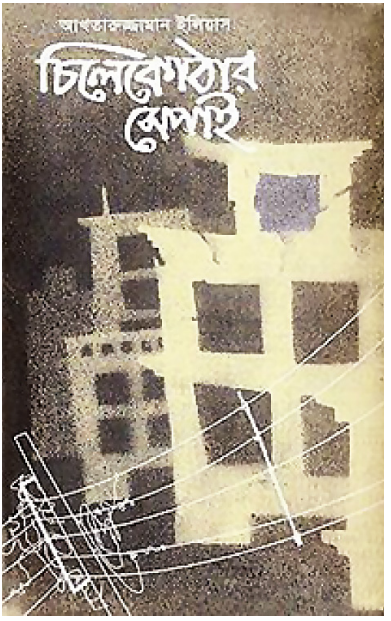

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের প্রচ্ছদচিত্র

Translation
Bangla to English

Rooftop Soldier: Chapter 13

Akhtaruzzaman Elias
Translated by Matthew D. Rich

Abstract

Set against the backdrop of growing political unrest in the end of 1960s Bangladesh (the then East Pakistan), the chapter 11 of the *Rooftop Soldier* unfolds in a vibrant student-led protest at Victoria Park, Dhaka. Amid chants and speeches calling for justice and autonomy, a range of characters, including student leaders, intellectuals, and ordinary citizens, grapple with the complex socio-political situation. The narrator of the story emphasizes the exploitation of Bengal by West Pakistan, highlighting issues like economic inequality, political oppression, and the denial of rights to the Bengali people. The course of story reflects the protagonist's, Anwar's, internal conflict deepens. His struggle to balance personal safety with a desire for meaningful change mirrors the broader societal crisis. The description of the meeting intensifies as slogans echo, and tensions rise between different groups, who are opposing for leadership in the movement. At the heart of the protest is Mokbul Hossein, a grieving father whose son was killed by police gunfire during a recent demonstration. His raw, emotional address becomes a pivotal moment, stirring empathy from the crowd but also causing a brief disruption led by the unconventional person Khijir, who attempts to restore order with humor. The story interweaves personal struggles, political tension, and collective anger, encapsulating the broader struggle for freedom and identity in a unrestrained time.

That university student who died today in the police shooting, Khijir had never seen him. If he hadn't ducked into the Medical College so he could throw stones at the police, right at that time he would have been between Dhaka Hall and PG[1]. The boy was shot right there. Suppose, if instead of entering the Ali Medical Hospital he had stayed in the procession. Then? The police lorry was beside PG, in front of the Roshid building. The shooting started from right there. Just imagine, Khijir is right next to him, they're moving along shouting slogans, just then the bullet grazed his arm and entered the chest of the boy next to him. It could have been like this, that the bullet-riddled boy collapses right onto him. All the people are running, he too is running, he's not having any problem at all running with the young man's dead body in his arms. So? As he is thinking about all this, the smell of fresh shit strikes him and lets him know that he's reached their slum. But is anyone able to curb his enthusiasm? Alright, that's it, the bullet could have struck his body too! Do the police bullets distinguish between educated/uneducated, rich/poor, student/laborer? No! A bullet in the chest just won't do. Dying now without clearing out a at least a few of them is not alright. Okay, think about it, if he gets a bullet in the left leg there's not all that much inconvenience. His two legs are like iron *pillars* after driving a rickshaw for so long. Then again, now he drives a scooter; since he's given up driving the rickshaw he's got chronic pain in those *pillars*, when he gets rained on, his legs throb. If a single bullet struck, the blood would run and that chronic pain would be cured for life.

After he lifted the flap and entered the house, the clamor of slogans, gunfire and tear gas in the area of Chan Khan bridge and Nimtoli reverberated in his head. He was washing his hand in his plate after having gobbled up his rice while seated on the floor when Jummon's Ma calls out from up on the bed, "Ate 't all did'cha?"

[1] An old and well known medical school and hospital in Dhaka.

"You didn't eat?"

"Did'cha ask? Did'cha ever in yur life ask? All's ya' care 'bout is yur belly. All ya' do is cram it in! Oh Allah, I figure he's hid two or three jugs worth in t'at handful of bones right there!"

As Khijir sits down over on this side of the bed he says, "Yur mohajon he done fit t'a whole Koltabazar water tank in that belly o' his, he did. Ya' brung back three or four jugs from the mohajon's belly yurself didn'cha?"

Khijir lies down on one edge of the bed as he's speaking, he thinks to himself as he scratches the armpit on his right side, if he'd been able to repel that bullet with this limb right here, that university student wouldn't have died. But right now the trouble is Jummon's Ma. At night who can stop her squabbling?

"Useless! What a halfwit idiot! Ya took the vehicle out today, yeah? Did'cha drive it? Yur bloody *baap*[2] 'll be payin' the bills, idn't it?"

This time Khijir loses control of his temper, he says, "Why's me *baap* gonna pay 'em? What, couldn't ya stay the night thru playin' *danguli* wit' yur mohajon-*baap*? What'cha come here fur? It's one in t'a mornin' and this bloody whore's fittin' to play that old broken record now, is she?"

This time Jummon's Ma's broken record plays at a terrific speed, "The mohajon be who's *baap*, that one t' whole neighborhood is knowin'! Did the mohajon even see me mother once in his life, did he? My father at least is just t'a one!"

Khijir is thinking to himself: taking off running like that from the place of the procession wasn't right. I mean, he wasn't able to hit the police with even one stone.

"Ya go out wit' the vehicle, then ya leave the vehicle in the street and go off flirtin', idn't it?"

This time Khijir is shocked, how'd the woman know that? He says, "Who's it said that to ya? Yur mohajon-*baap*, idn't it? Lightnin' is gonna strike yur mohajon right on his head, it is. Ya hear me?"

"Quietly, quietly! Ya stay in the mohajon's own room, yet ya go on talkin' rubbish 'bout him. Ya got no shame, do ya?"

"Stayin' fur noothin', am I? I don't pay rent?"

But Jummon's Ma keeps bringing up the same subject, in the morning he went out with the baby taxi, then in order to watch the people's craziness he left the vehicle in the middle of the street? What's the meaning of all that? The mohajon may be a bad guy. That's true. But for how long will Alauddin Miah stand for Khijir's craziness about watching all this monkey business?

---

2 word for father

Khijir asks again, "I'm askin', then who's it spreadin' these lies?"

Is there any shortage of people to do that?

This afternoon Alauddin Miah himself went to Rohmotulla's house. When he got there he said, "Uncle, a *university istudent* died, the police were firin' on him. Be a bit careful, alright! The *publik* is right fired up 'bout Ayub Khan! Monem Khan has started thrashing himself like it's *matam*!"[3]

"You all'll rip out Ayub Khan's pubes ya will!" Rohmotulla is angry, "Let 'em drop a few more bodies and all that squealin' an' howlin'll be right hush as a forest."

Alauddin, however, doesn't get angry, he says in a normal tone of voice, "I don't think so. With this university student dyin' Nurul Amin is finished, isn't he? Just you be a bit careful. They smashed the Amligola Muslim League office."

Rohmotulla barks at his daughter to bring some tea; the daughter went to visit at the next door neighbor's house. It's Jummon's Ma who brings the tea. Setting down *bakerkhani, panir* and tea on the table she was on her way out when Alauddin says, "What's all this that Khijir is doin'? He goes out with the baby taxi then leaves it with some guy in the street. What if that bastard 'ad nicked it an' run off!"

Slightly angry and slightly wounded, the mohajon sits silently for awhile. Then he says, "Ya'll won't leave me none of me honor! After you chase 'im off, the very next day I'll give that son-of-a-whore the boot and put 'im out in the street! And that Jummon's Ma o' mine, I'll marry her off to Kamruddin."

"Kamruddin? He'll marry her?"

"If ya give 'im cash, yur sayin' he won't? I'm building a road at Dolai Khal. Aren't I gonna be needin' masons fur that?" The mohajon goes on with so many complaints about Khijir! He has the gall to get up at Victoria Park and slander the very same person who fed him growing up! "Miah, ya understand, these are dark days. If they weren't I could take one toe o' me foot and squash all them grubs and insects right into the earth."

Listening to the conversation between the uncle and nephew Jummon's Ma got quite frightened! That was the reason the mohajon had sent Jummon today to Malibag to find Kamruddin?

Today in the evening Alauddin Miah had scolded Khijir a little. He doesn't like it when people give out his vehicles like that to just anyone. In fact Khijir thought that he should have left the vehicle in the garage himself. These are bad times, who knows when somebody will take a vehicle and just disappear? If one baby taxi is lost just think how much of the *shayeb*'s money will be wasted! Seeing the throng of students in

---

[3] An ironic reference to the customary self-flagellation that is part of the Shiite observance of Muharram, *matam* is the name for these practices.

front of the university at Neelkhet he just lost his head. He was taking a passenger from New Market to Kamlapur station, seeing the student procession at Neelkhet he wanted right then and there to join their throng. They were really going at it with the slogans at that point, the procession was going in the direction of Fuller Road. Behind, the police vehicles were standing in front of the girl's hostel, in the street was the police barbed wire barricade. After dropping the passenger at Kamlapur he had just started heading back to the garage, in the area near the garage Ronju, Korim, Hosen, they were hanging around--if he gives one of them the baby taxi for 5 taka, in the afternoon he can pick up that money from them and give it to the *shayeb*, that'll work just fine. Is Alauddin really going to investigate who drove the vehicle throughout the entire day? But in front of the State Bank in Motijhil he sees Adom Ali standing waiting for the bus. The poor guy's cheeks have sunk in, more than half of his prickly beard has turned grey. About a year back he too used to drive one of Alauddin's baby taxis, then he gave up the job and went back to the village to work the fields. Somewhere in there, one day Khijir saw him with a vegetable basket on his head calling out, "potatoes, *potol*, green chilies, dried fish" as he walked along K.M. Das Lane. Today Khijir called Adom Ali over in front of the State Bank, sat him down beside him said, "You wanna drive?" The damn country bumpkin[4] was so grateful he couldn't hardly speak. Khijir got down near Gulistan and said, "Give me five taka, the rest of the money you can give me tonight at eight, I'll wait in front of the garage. And don't tell the *shayeb*!"

Adom Ali sits down in the driver's seat and asks for the license. If the police stop me it'll cost me some coin!

"Screw the police! All them police is at the university now!"

Khijir is cursing out the police but he also doesn't agree to hand over to Adom Ali the license or registration, "What license? Go'n now, git!"

Partway by bus but walking and running most of the way, Khijir caught up to the procession in front of the *shahid minar*. He was able to catch up to the procession because there was a meeting going on at the *shahid minar*. Advancing with the procession he arrived at the south gate of the medical college hospital, there he sees students throwing stones at the police from inside the hospital. After climbing over the railing Khijir too starts throwing bits of brick and stones. As soon as the shooting starts, Khijir ducks inside the PG Hospital going through the medical college. Not long ago there was a university here. Khijir used to regularly bring two girls from the neighborhood here by rickshaw. All the people are running in the opposite direction, and what do you know, he is sprinting like a maniac towards the PG gate. At the gate are

4 This one I'm not sure about. My guess is that this is a phonetic spelling of a dialect pronunciation of the word gramyo, which I've translated as "country bumpkin".

three huge police lorries. Again he goes back and around the pond next to Beltola and ends up standing at the end of the Roshid building. The police and the EPR trucks now are going in the direction of Nazimuddin Road. All around Khijir the fleeing throng press in upon him. "They're shooting, they're shooting", "He's died", "No, he didn't die", "There's bleeding", "They took him to the hospital"--amidst all these sorts of conversations people were running chaotically. The red car was coming from the TB Clinic. This time they let loose with the tear gas. Stones and bottles were raining down on the police from the roof of Dhaka Hall. The police are retreating, they're entering the slum next to the rail line. Reaching what was more or less a safe distance, the police and the EPR[5] guys started indiscriminately beating people inside the slum. With the combined force of the police and EPR brought to bear, the entire slum became a chaotic spectacle. To demolish all these brick and hardboard houses didn't require the use of a bulldozer; the butt of a rifle is more than enough. It was like a herd of elephants was tramping through the slum. The houses were all dropping like dominoes. On top of that were the rifle butts slamming down on the people's backs, chests, backsides and heads.

"Oh Allah, oh Ma", "Baba, we're poor folk, don't understan' nothin'", "Baba, you're like a father to us!"--men, women, boys, girls all wailing and pleading, the slum dwellers running to and fro, then again the exploding of tear gas shells from over there. Khijir is running. At that time his ears thirsted to hear the slogans. If you heard the slogans you understood that the people were standing up against the police. He was running with long strides along the rail line, that was when he saw Jummon, Jummon was running in the opposite direction. Khijir stops for a moment to call out to Jummon, immediately the butt of a rifle strikes his neck. Again Khijir must run. The police are entering the houses and breaking them apart, the sound of clay jugs and cooking pots being smashed gradually gets louder. While this is going on, some people duck their heads into their houses to remove their worthless jewelry and in the process they get poked in their backsides and lower back by the butt of the rifles. In the end Jummon was nowhere to be found.

After, after all that time he realized, wait, Jummon's not on the bed. Khijir asks, "Where's Jummon at?"

"He's not comin'." Jummon's Ma replies, "The mohajon barred his daddy from sendin' 'em."

"What?"

"He called the *mistri* an' said, the boy'll stay wit' his daddy. I'll give ya a place to stay."

"How's that?"

"The mohajon ain't gonna let you stay here no more. Says, he stays in me own house and thinks he'll make o' enemy o' me! He's right.

---

5 East Pakistan Rifles

How's the mohajon gonna stand fur that?"

In the evening today, right in front of Jummon and Jummon's Ma, the landlord was talking with Kamruddin, "Miah is livin' wit' his missus and the boy. I'mma give that ungrateful bastard th' boot, I will! The work on the road over top of Dolai canal is moving along, there'll be no shortage o' work fur you!"

Kamruddin did not answer. Jummon's Ma just then was washing dishes next to the faucet at one corner of the paved courtyard and kept looking in his direction over and over.

The landlord was enraged, "Ya saw his recklessness, idn't it? In the meetin' he's talkin' bad 'bout me, ya understand? Son of a whore. What else he gonna be, yeah? Right, stay then in the Kandupatti red-district, stay an' be yur momma's pimp then! Stay an' be yur sister's pimp too! You'll take yur beatins from yur momma and yur sister's *customers* and pass yur days like that, that'd be good! Idn't it? I'm giving him a place to stay, I fed 'em an' raised 'em, now the whore's boy has gone'n grown hisself wings!" Listening to all this, Jummon's Ma's black hands streaked with ash, straw in her grasp, continued to work but with tremendous speed now.

"What'd you say?" Khijir asks his wife, "Ya didn't say noothin'?" Jummon's Ma lies from time to time, but she doesn't overstate things. But did she have to repeat the landlord's cursing about Khijir Ali so exactly! Given the chance, the bitch gave herself a little satisfaction cursing him out, no?

Khijir says, "What'd I say bad 'bout the mohajon? Manu from the neighborhood, that day wasn't he gonna throw 'em on the ground and bash 'em? Did I speak false? His own nephew, for God's sake, is our boss, we're there with Alauddin Miah hisself. His nephew isn't doin' the meetin's? He's not doin' the processions?"

"Who is you an' who're ya judgin'? His own nephew? *Shayeb* Manu? In a couple days it's said the mohajon is gonna get him married to his own daughter! All's you are is a servant and yur fixin' to have yur name written next to his? Oh my my, this man o' mine! Where's the queen, and where's the gal gettin' fucked!"

Khijir would like to give that bitch one good punch and split her face right up nice. But Jummon's Ma doesn't give him the chance and says, "The mohajon has shut right up seein' all that marchin' and noise makin'; otherwise how long it be 'fore he sent you packin'?"

"If he sent me packin', I'd be fine to go! There's a shortage of places to go in Dhaka city, is there?"

"Is he gonna give me work to do? After kicking you out, if the mohajon don't marry me off to the *mistri*, is he gonna let me work?"

"Then ya won't work there! If ya wanna work, what, there's nowhere else t' work?"

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের রচয়িতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

"Oh, *baba*! Them right there is some men's words alright! The mohajon'll give me boy a rickshaw, me a place to stay. We'll give that all up and go stuff ourselves inside yur rib cage an' stay, idn't it? Even that is noothin' but a bag o' bones! Ya think ya can keep me in a cage o' bones, huh? This un's a bloody moron he is!"

While this was going on, Bozlu came home next door singing a drunken tune at the top of his lungs. He entered, sat down and immediately started puking his guts out. Right away Bozlu's wife started with the screaming, "Comes back home at night after drinkin' all that shit, now who's gonna clean it up? Who washes all that?" Next, once the sound of the vomiting stopped then came the sound of the beating. With the first slap the woman yelled back, with the second, silence. After that Bozlu threw her to the floor and rained kicks down on her. When there was a pause in the stream of kicks Bozlu's wife mumbles, "After a beatin' from the cops, this crook is feelin' lively, huh?" In answer Bozlu again starts kicking her. This girl is severely twisted: between taking those kicks the pithy comments she was making were more than enough to goad that drunk on. Over on this side, Jummon's Ma is mumbling, "Oh my! Five months pregnant she is! Oh my!" Then, raising again the previous topic, she says in a tone that's practically pleading, "Hey, ya know what I mean, talk wit' the mohajon, if ya say it the right way t' the mohajon...?"

But nothing she says goes in Khijir's ear. Bozlu is kicking his pregnant wife. A steady stream of blood is coming out from Khijir's eyes and floods the floor of any one of the building's stairwells; Bozlu's wife's body lies submerged in that blood.

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের আমেরিকান ইংরেজি অনুবাদক ম্যাথিউ ডি. রিচ

Khijir leaps up and goes outside. It only takes him one kick to knock the drunk to the ground. Sprawled out lying on the ground Bozlu, choking on his words, swears at him, "Who'r you anyway? Ya keep yur own the whole bloody day over at th' mohajon's like she's collateral, 'n nighttime ya come back to take mine, idn't it? If one day I don't throw ya down and break both yur legs, ya bastard, then I ain't me daddy's son! Even the mohajon ordered it! Told me to one day take the whore's boy, finish 'em right off, stuff 'em in a sack, tie it up and toss 'em into a *manhole*! You wait!" Bozlu's words, garbled perhaps, were neverthless intelligible.

Jummon's Ma had gone to sleep. Khijir went out into the street a bit and stood. In the spaces between the moss and ivy-covered, brown buildings two or three stories tall the moon was visible filling the sky. All over the deserted street the garbage lay swaddled in moonlight. There seemed a terrible void in Khijir's chest. Did the mohajon send Bozlu after him? His body feels cold. He needs to go inside. Tomorrow is the strike. The procession needs to be lead from here to the university. Alauddin Miah, after scolding him about the baby taxi, said over and over that Khijir was to bring the rickshaw wallahs and be in front of the office first thing in the morning. The *shayeb* even told him what slogans had been chosen. No! He needs to sleep now, tomorrow he needs to wake at dawn.

খণ্ড ১৯, সংখ্যা ২৩
Vol. 19, No. 23

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

জুন ২০২৫
June 2025

doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.7

সাক্ষাৎকার

পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমার আগ্রহ বাড়ছে

কিথ ই. কান্তু

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সাইমন জাকারিয়া

সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে কিথ ই. কান্তু, ২০২২

Interview

My interest in manuscripts is growing

Keith E. Cantú

Interview taken by Saymon Zakaria

Abstract

This interview features a reflective conversation between American scholar Dr. Keith E. Cantú and Bangladeshi researcher Dr. Saymon Zakaria, focusing on Dr. Cantú's journey into Bengali language, spiritual traditions, and music culture in Bangladesh. Inspired by the films of Satyajit Ray and Ritwik Ghatak, Dr. Cantú began learning Bengali and later deepened his engagement through a Fulbright Fellowship in Dhaka in 2010, where he also encountered Baul-Fakir communities.

His research explores the intersections of Sufism, yoga, and esoteric traditions in South Asia. His master's thesis, based on the Bengali text Yoga-Kalandar, examines how these diverse spiritual ideas connect through shared concepts and practices. A central topic in the interview is the book *City of Mirrors: Songs of Lalon Sai*, co-edited by Cantú and Zakaria, and based on the fieldwork of Dr. Carol Salomon. This work blends textual analysis, oral tradition, and lived experience, offering new insights into Lalon's songs—for instance, correcting common interpretations through field-based evidence.

The interview also highlights how both Salomon and Cantú approached their research with deep respect for spiritual practitioners. Cantú's PhD research on Tamil Yogi Swami Sabhapati similarly explores the blending of Theosophy and Yogic practice in South India.

Overall, the conversation offers important lessons for emerging scholars, emphasizing the value of philological methods, the importance of oral traditions, and the need for humility, openness, and sincerity in spiritual and academic inquiry.

কিথ এডওয়ার্ড কান্ত মূলত একজন আমেরিকান ধর্মতত্ত্ববিদ। যাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, "পশ্চিমা দুনিয়ার গবেষকরা আমাদের মরমি গানের সাধনা কতটা বুঝতে পারেন?" তাঁদের জন্য কিথ ই. কান্ত এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ। কেননা, একজন আমেরিকান পণ্ডিত হিসেবে তাঁর পরিচিতি থাকলেও, কিথের সাধনা এবং অনুসন্ধানের ক্ষেত্র মূলত দক্ষিণ এশিয়ার প্রাণময় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য। বাংলাদেশের লালনপন্থী বাউল-ফকির সাধকদের থেকে শুরু করে ভারতের তামিলনাড়ুর সিদ্ধ-যোগীদের ভাবধারা, এমনকি পশ্চিমাদেশের থেলেমা (Thelema), থিওসফিক্যাল সোসাইটির (Theosophical Society) প্রভৃতি সাধনার বিস্তৃত এক অন্তর্লোকের অন্বেষা কিথের গবেষক-জীবনের সাথে একযোগে বিরাজমান। উল্লেখ্য, এরমধ্যে কিথের আন্তঃবিভাগীয় গবেষণাকর্ম মূলত দক্ষিণ এশিয়ার যোগ-সাধনা, তন্ত্র এবং সংস্কৃত, বাংলা, তামিল, হিন্দি প্রভৃতি উপমহাদেশীয় ভাষার আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আবর্তিত হলেও তিনি উদারভাবে পাশ্চাত্য সাধনার সাথে তুলনা করতে পারঙ্গম ও তৎপর।

বর্তমানে তিনি নিউইয়র্কের সেন্ট লরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব বিভাগের ভিজিটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'Yogic Studies'-এও শিক্ষাদান করেন। এর আগে তিনি জার্মানির ফ্রিডরিশ-আলেকজান্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ের Center for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences-এ গবেষক ছিলেন এবং পোল্যান্ডের ক্রাকভ শহরের ইয়াগিয়েলোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে "Cultures of Patronage: India 1674–1890" প্রকল্পে পোস্টডক্টোরাল সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কিথ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, সান্তা বারবারা থেকে ধর্মতত্ত্বে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন, যেখানে তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত ডেভিড গর্ডন হোয়াইটের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেন। এছাড়া, তিনি ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে দুটি মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে তাঁর প্রথম গ্রন্থ *Like a Tree Universally Spread: Sri Sabhapati Swami and Śivarājayoga* প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি ঊনবিংশ শতকের তামিলনাড়ুর সাধক সভাপতি স্বামী ও শিব-রাজযোগ সাধনার উপর আলোকপাত করেছেন। এছাড়াও, তিনি সভাপতি স্বামী ও তাঁর গুরুবৃন্দের বহুদিন অবহেলিত বা বিস্মৃত তামিল ও হিন্দি গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ ও অনুবাদের কাজ করছেন। শুধু সভাপতি স্বামী নয়—কিথের গবেষণা বহু বিস্তৃত। তাঁর রচনায় যেমন আছে বাংলা ভাষায় তান্ত্রিক-সাধনা ও গানের নৃবিজ্ঞানভিত্তিক

বিশ্লেষণ, দক্ষিণ ভারতের মন্দির ও সমাধিস্থলে মন্ত্র ও যোগ চর্চার ইন্দোলজিক পাঠ, শ্রীশৈলমের সংস্কৃত রসায়নময় পুরাণবিশ্বের ব্যাখ্যা, তেমনি আধুনিক যোগসাধনা ও 'ওরিয়েন্টালিজম' ও সাংস্কৃতিক প্রামাণিকতা সম্পর্কিত বিশ্লেষণ, থিওসফি মতবাদের প্রেক্ষিতে হঠযোগকে "কালো জাদু" হিসেবে বিবেচনা, এবং বাংলার বাউল-ফকির গানে ইসলামি গূঢ়তত্ত্বের পাঠ। বর্তমানে তিনি বাউল সংগীত ও তার গূঢ় দিক নিয়ে একটি নতুন গ্রন্থ রচনার কাজে নিয়োজিত, যেখানে তিনি ধর্মতত্ত্ব এবং সংগীতনৃবিদ্যার পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন।

ড. সাইমন জাকারিয়ার সাথে যৌথভাবে তাঁর সম্পাদনায় লালনের বহু গানের ইংরেজি অনুবাদক প্রয়াত ক্যারোল স্যালোমনের *City of Mirrors: Songs of Lālan Sāi* গ্রন্থটি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের South Asia Research সিরিজে প্রকাশিত হয়েছে।

একজন সংগীতশিল্পী হিসেবেও কিথ সমান সক্রিয়। তিনি স্বশরীরে ভারত ও বাংলাদেশের আখড়াবাড়িতে অবস্থান, সাধু-ফকিরদের সঙ্গে সান্নিধ্যে থেকে ঐতিহ্যগত বাদ্য একতারা, বায়া ও দোতারা বাজিয়ে লালনের সাঁইয়ের গান ও শ্যামাসংগীত পরিবেশন করতে সক্ষমতা অর্জন করেছেন। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার বিগ সুরে অবস্থিত এসালেন ইনস্টিটিউটে (Esalen Institute) এই সংগীতের সঙ্গে তান্ত্রিক ধ্যানচর্চার সম্পর্ক নিয়ে একটি কোর্স সহ-শিক্ষক হিসেবে পরিচালনা করেন।

কিথ বহুভাষায় পারদর্শী। তামিল, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, বাংলা ও ফারসি ভাষায় পাঠক্ষমতার গুণে তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাঠ, সম্পাদনা ও অনুবাদে সক্ষমতা অর্জন করেছেন।

সব মিলিয়ে কিথ ই. কান্ত গবেষণা, সংগীত ও আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপের এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন, যা তাঁকে সমকালীন দক্ষিণ এশীয় মরমি ঐতিহ্য গবেষণার এক ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিথ ই. কান্তর গবেষণা-যাত্রা, বাংলার বাউল-ফকিরদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, দক্ষিণ এশিয়ার মরমি ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক দর্শন নিয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির বিশদ অন্বেষণের তাগিদে এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন *ভাবনগর : ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বেঙ্গল স্টাডিজের* সম্পাদক ড. সাইমন জাকারিয়া।

সাইমন জাকারিয়া: কিথ ই. কান্ত, আমি তোমাকে প্রথম দেখি ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে রাজবাড়ীর পাংশায় বাউলদের নিগ্রহের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত একটি সাধুসঙ্গে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো তোমার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার শিয়াটলে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি এলাকায় ড. রিচার্ড সলোমন ও ড. ক্যারোল সলোমনের বাসভবনে। তুমি বাংলা খুব ভালো বলো। এক্ষেত্রে আমার প্রথম প্রশ্ন, তুমি কবে থেকে, কোথায় এবং কেন বাংলা শিখতে শুরু করেছিলে?

কিথ ই. কান্ত: আমি প্রথমে ২০০৮ বা ২০০৯ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছিলাম। সে সময় তো আমি বাংলা ভাষা জানতাম না। তখন আমার সাথে কয়েকজন বন্ধু ছিল, যার মধ্যে একজন বন্ধু ছিল বাঙালি। আর তারা বাউল নিয়ে আর সিনেমা নিয়ে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছে। সেই সময় বাংলা সংস্কৃতির উপরে আমার কিছু আগ্রহ ছিল। সাধারণত প্রাচীন বাংলা সিনেমা—যেমন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এদের দু-একটা ফিল্ম দেখে আমার আমার আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। তবে সব সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে আমি ভাবতাম যে, আচ্ছা এই সীমান্ত পার হয়ে গিয়ে

বাংলাদেশের সাইডে কি হচ্ছে? কেউ তো বাংলাদেশ নিয়ে তেমন কিছু বলছে না, মানে আমার জীবনে বা আমার বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে কেউ তো বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতো না, বা বাংলাদেশিদের চিনতো না। তারপর আমি একটা 'ফুল ব্রাইট ফেলোশিপে'র এপ্লাই করেছিলাম, আমার আন্ডারগ্রাজুয়েট শেষের বছর। আর এটা তো পাওয়া হয়ে যায়। এতে খুব খুশি হই, এই কারণে যে, এই ফেলোশিপ পেয়ে আমি এক বছর বাংলাদেশের যেতে পারতাম, এটা ২০১০ সালের কথা। এটা পেয়ে প্রথমত তিন মাসের একটা বাংলা কোর্স করতে পারতাম, আর সে বাংলা কোর্স তো অনেক ইনটেনসিভ ছিল—সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ক্লাস করতে হতো, তারপর বাড়ির কাজ ছিল, অনেক। এটা শুরু হয়েছিল ঢাকার বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটে তিন মাস ধরে। সেসময়ের মাঝখানে আমি শাহবাগে গিয়েছিলাম অনেকবার, রমনা কালী মন্দিরে বেড়াতেও গিয়েছিলাম একবার। তারপর কয়েকজন বাউলশিল্পী-সাধকদের সাথে মিশেছি, সেই সময় গান-বাজনার মধ্যে ঢুকে পড়িছি। এই সব কিছু মিলে বাংলার উপর আমার আগ্রহ-আকর্ষণ তৈরি হয়ে গেছে। প্রথমে তো ছিল সেই সাধনের ক্ষেত্রে, আমি একটা বই পড়েছিলাম সেই আল্টার আডোলন বা জন ওয়েডর্ফ-এর, এটা তো আসলে কয়েকজন লেখক, এই নামের মধ্যে আল্টার আডোলন। মানে কেউ তো বাঙালি, আর একজন বিদেশী ওয়েডর্ফ। আর সেই বইয়ের মধ্যে সেই সাধনার একটা শব্দ ছিল। তবে, আসলে কি হয় সংস্কৃতি ছাড়া? কি হয় দেশের মধ্যে? সাধারণ মানুষের মধ্যে? শিল্পীদের মধ্যে? সাধকদের মধ্যে? আমার কোন ধারনা নেই সেই সময়। এই আগ্রহ থেকে আমার বাংলা আরও শিখতে আকর্ষণ বাড়তে বাড়তে থাকলো। যখন আমি বুঝতে পারতাম যে, এই সাধনা এটা শুধু একটা কাজ বা একটা মেকানিক্যাল, মানে নীরব একটা কিছু আর কি বা কষ্টের একটা কিছু বা যেরকম কাজে কোন আনন্দ নেই। কিন্তু আসলে সেটা নয়। আসলে একটা গানের মধ্যে সাধনা আছে, একটা গান লেখার মধ্যে কত প্রতীক আছে, একটা পাজলের মত, একটা শব্দের অর্থ নিয়ে কত সময় ভাবতে হয়, তাই না! এ পথে তো এসে বাংলার উপর অনেক আগ্রহ তৈরি হলো।

সাইমন: বাংলা ভাষাটা তাহলে তুমি কোথায় প্রথম শেখা শুরু করেছিলে?

কিথ: বলেছিলাম যে, বারিধারার বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটে, এটা তো সেই ঢাকায়। সে সময় ডিরেক্টর ছিলেন রাজিমা চৌধুরী। এখন উনিতো বর্তমানে আমেরিকাতে। তারপরে আমি ওয়াশিংটনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিরে এসে, সেই একবছরের ফেলোশিপের পর আমি ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনে নন্দিনী আবেদিনের কাছে পড়াশোনা করেছিলাম। বাংলায় কয়েকটা কোর্স নিয়েছিলাম। সে সময় বেশিরভাগ কোর্সেই আমি একা ছিলাম। বেশিরভাগ লোকের তো বাংলা শেখার বিষয়ে আগ্রহ ছিল না। কয়েকজন মাত্র ছিল সে সময়ে। তবে আমার কাছে আগ্রহ অনেক বেশি ছিল। তাই শিখতে শিখতে আস্তে আস্তে অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সাইমন: আচ্ছা। বাংলা ভাষার তো অনেক রূপ। তুমি যে কথা বলছো তার একটা সাহিত্যিক ভাষা আছে, সাধারণ জনগোষ্ঠীর ভেতরে ভাষার আরেকটি বহু রূপ আছে। তুমি এ সব জানো, যেহেতু তুমি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছো। তুমি দেখেছো সাহিত্যিক ভাষার একটা রূপ আর লোকায়ত ভাষার আরেকটি রূপ। এই দুইটা রূপের মধ্যে তুমি যখন গবেষণা করতে যাও কোন রূপটা তোমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে?

কিথ: প্রথমে ছিল লোকায়ত রূপ। লোকজনের সাথে যোগাযোগ করতে, মিশতে খুব ভালো লাগতো প্রথম থেকে। অবশ্যই বই পড়তেও ভালো লাগে, আর সেই

সংস্কৃত ভাষার উপর একটা আগ্রহ ছিল; মানে স্পষ্ট, অলংকার দেওয়ার ভাষা বলতে খুব ভালো লাগে। তবে সেই লোকায়ত একটা রূপ আছে গ্রামের মধ্যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে, আসলে সাধারণ নয় এটা, অসাধারণ! আর এটা তো শিখতে শিখতে আমি একটা স্বাগতম পেয়েছি, যদিও আমি বিদেশি, অন্য দেশ থেকে এসেছি। এই লোকায়ত ভাষা শিখতে শিখতে ভাবতাম যে, আমি বড় একটা পাড়ার মধ্যে আর কি, একটা পরিবারের মধ্যে, যারা বাংলায় কথা বলতে পারে, এটা খুব সুন্দর একটা মন্ডল, আর এই মন্ডলের মধ্যে থাকতে আমার ভালো লাগে।

সাইমন: আরেকটি বিষয় জানতে চাই, বাংলা সাহিত্যের একটা বিশাল জায়গা আছে, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা পাই, আধুনিক সাহিত্যের আরও অনেকে আছেন, এসব জায়গা নিয়ে কি তোমার কখনো আগ্রহ হয়েছে?

কিথ: হ্যাঁ, আগ্রহ ছিল—সেই রবীন্দ্রনাথের উপর। আমি প্রথমে বাংলাদেশে এসে রমনা কালী মন্দিরে গিয়েছি, সেদিন কালী পূজার একটা রাত ছিল। সে সময় কেউ একজন একটা হারমোনিয়াম নিয়ে এসেছে গান গাইতে, আর একজন সাধিকা ছিল সে খুব ভালো রবীন্দ্র সংগীত গাইতে পারতেন।

সাইমন: সেই সাধিকার নাম কি যোগিনী কৃষ্ণা দেবী?

কিথ: হ্যাঁ, যোগিনী কৃষ্ণা দেবী। খুব ভালো ক্যারেক্টার, তিনি অনেক কিছুই জানেন। গানের মধ্যে সার কি? আর রবীন্দ্রনাথের ভাব কেমন একটা প্রকাশ আছে? সাহিত্য আর কবিতার উপরে আগ্রহ অবশ্যই আছে। তবে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যে কবিতার কিছু একটা আধ্যাত্মিক মর্ম আছে, তার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক মর্ম বা মানুষকে নিয়ে কিছু কথা আছে, এভাবের কবিতা পড়তে ভালো লাগে। আর সব কবিতা তো ভালো, যেমন অনেক গীতি আছে—নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সংগীত। আর বিভিন্ন লেখক আছে যারা উপন্যাস লেখে, কত কত বিভিন্ন নাম আমি শুনেছি। হতে পারে আরো পড়ার দরকার আছে। তবে আমার আগ্রহ সবসময় ছিল যে, নিজেকে চেনা, আর সেই সাধনার পথে কি কি আছে? তা জানা। ওই দিকে। যেভাবে কবিতা ওই পথের ইঙ্গিত দেয়, সেটাই আমার বেশি আগ্রহ ছিল, আর এটা ছোটবেলা থেকেই আমি এরকম।

সাইমন: তোমার ছোটবেলা থেকেই সাধনা এবং সাধনার নানা বিষয় নিয়েই তাহলে এক ধরনের আকর্ষণ ছিল? তাই তো?

কিথ: হু, আকর্ষণ তো ছিল, তবে বাংলা ভাষায় তো এটা তৈরি হয়নি। তবে, এটা ঠিক, আমার বাবা একজন খ্রিষ্টান পুরোহিত ছিলেন, আমার মাও এরকম দিকে। আমার বাবা আমার বয়স যখন ১৫ বছর ছিল তখন মারা গেছেন। আর সেই সময় থেকে অনেক প্রশ্ন ছিল ছিল যে, আসলে ফেরেশতা কি? অ্যাঞ্জেল কি? গড কি? আসলে গডের সাথে তো যোগাযোগ করা যায়। আর তারপর চোখ বন্ধ করে, বাইরের জানালা দিয়ে দেখে কল্পনা করেছিলাম যে, আসলে তো দেহত্যাগ করে বা ছেড়ে দিয়ে আমি পাখির মতো উড়ে যেতে পারি কি-না, এরকম একটা অদ্ভুত, অসাধারণ প্রশ্ন তো থাকতো।

সাইমন: তখন তোমার এরকম চিন্তা হতো!

কিথ: হ্যাঁ, এই চিন্তা তো ছিল। আর এটা তো ছোটবেলায় আর কি, স্কুল লাইফে। বেশি জানতাম না। তবে আস্তে আস্তে আমি গবেষণা করছিলাম। আর তখন ওই দেশে বিভিন্ন সাধনার রূপ আছে, তা জানতে শুরু করি, যেমন— থেলেমা, থেলেমার মধ্যে কিছু ম্যাজিকের কথা আছে, কিছু অনুষ্ঠান করার কথা আছে। সেই

সময় ঐদিকে গিয়ে আমি ওই পথের মধ্যে যোগ-সাধনা কথা পেয়েছি। আসলে, আসলে ধ্যান কি? আসলে তত্ত্ব কি? বিভিন্ন মহাভূত আছে, সেসব কথা, সংস্কৃত ভাষা আসলে কি? আর ওই দিকে গিয়ে আস্তে আস্তে ওই আগ্রহ বাংলা ভাষার মধ্যে এসেছিল। তবে সেই মূল আগ্রহ আমার মাতৃভাষায় সব সময় ছিল, এটা কোনদিনই চলে যায়নি। বাংলা শিখে আমি এখনো সেই কিথ কান্ত—যদিও অন্য ভাষায়। কিন্তু সেই একই আগ্রহের দিক রয়ে গেছে। আর বাংলায় আমি বুঝতে পেরেছি যে, অনেক অনেক জীবন্ত কথা আছে, এটা শুধু বইয়ের মধ্যে না, এটা শুধু জাদুঘরের মধ্যে না, আসলে এই সাধনার কথা অনেক জীবন্ত, আর এটা অদ্ভুত কিছু না, এটা দৈনিক জীবন। মানে কিভাবে আমি পরিবারের সাথে যোগাযোগ করবো? কিভাবে আমি সমাজে গিয়ে আমি একটা চা খেতে বসি? কিভাবে আমি চায়ের কাপটা হাতে ধরবো বা আমি খাব বা কিভাবে আমি সেই চাওয়ালার সাথে কথা বলবো? সব কিছু সে ভাব প্রকাশের অংশ। এই ভাব প্রকাশের সাথে সাধনার একটা মিল আছে। আর এটা ব্যবহারের সাথে একটা মিল আছে। আর সেটাতে খুব আগ্রহ ছিল। আসলে ওই সম্পর্ক কি?

সাইমন: তোমার জীবনের সাথে গবেষণার একটা সম্পর্ক আছে, এটা বিচ্ছিন্ন কিছু না। একেবারে তোমার বাল্যকাল থেকে শুরু করে কৈশোর জীবন, এবং তার সাথে তোমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে সাধনার যোগ। সেই সাধনার যোগের সাথে পরবর্তীকালে তুমি যখন বাংলা শিখছো, বা বাংলাদেশে আসছো, সেখানেও সেই যোগের সাথে একটা সম্মিলন করার চেষ্টা, একটা তুলনা করে নিজে আরেকটা পথের সন্ধান করার একটা চেষ্টা তোমার প্রথম থেকেই সব সময় আছে। তুমি যখন আমাদের *ভাবনগরে* প্রবন্ধ লিখেছ, তখন একদিকে লালন ফকিরকে নিয়েও লিখেছ, অন্যদিকে থেলেমা ট্রাডিশন নিয়েও লিখেছ, আবার তোমার পিএইচডি গবেষণার যে বিষয় সেই সভাপতি স্বামীর সাধনা নিয়ে লিখছ। সবমিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, বহু জাতিক যে সাধনার ঐতিহ্য সেই সাধনার ঐতিহ্যের তুমি একজন নিবিড় পর্যবেক্ষক। এই দিক থেকে তোমার কাছে আমার প্রশ্ন, তুমি যেহেতু বহু জাতিক সাধনার ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা করছো সেহেতু তোমার কাছে কি মনে হয়— সকল সাধনার ঐতিহ্যের মূল প্রবণতাগুলো একই রকম?

কিথ: একই রকম না। আমি একজন মানুষ, তাই না? আর তুমি একজন মানুষ, তাই না? তোমার ভাব প্রকাশ তোমার ভাষায় হবে, তোমার আগ্রহ অনুযায়ী। অবশ্যই একটা লেভেলে ঠিক আছে—সব কিছুর শব্দ, সব কিছু ভাষা, সব কিছু ব্রেনের কাজ, মন থেকে আমাদের প্রকাশ হয়। তবে বিভিন্ন রূপে এরকম সাধনার প্রকাশ তো হয়ে গেছে। আর আমি বলবো না যে, সবকিছু একই। কারণ, অবশ্যই বিভিন্ন রঙ আছে—এই পৃথিবীর রংধেনুর মধ্যে, এ কথা বলা যায়। কত বিভিন্ন রঙ! আমার আগ্রহ হলো প্রত্যেক রঙ আমি বুঝতে চাই। আর আমি বুঝলে, তারপর আমি তুলনা করতে পারি। তবে না বুঝলে, আমি একটা রঙ বাতিল করলে বা বাদ দিলে বা রিজেক্ট করলে, তাহলে সে রঙ তো আমি সারা জীবনে বুঝবো না। আর আমার কাছে এটা একটা কঠিন ব্যাপার। কারণ, একটা রঙ না বুঝলে পুরো রঙধেনুর অর্থ থাকে না।

সাইমন: আমরা দীর্ঘদিন একসঙ্গে একটা কাজ করেছি, সেটা হলো লালন সাঁইয়ের গানের ক্যারোল সলোমনের করা অনুবাদের সম্পাদনার কাজ। তার আগেই তুমি লালনের গান নিজের মত করে বুঝেছ, এখানকার ফকিরদের সাথে থেকে বুঝতে চেষ্টা করেছো। ফকিরদের সঙ্গে থাকার অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে লালনের

গানের চর্চার কি চরিত্র তুমি প্রত্যক্ষ করেছো সে সম্পর্কে আগে তোমার কাছ থেকে একটু জেনে নিতে চাই। তারপরে অন্য প্রসঙ্গে পরে আসবো।

কিথ: কি চরিত্র? মানে প্রথমে যারা আমার কাছে লালনের নাম প্রকাশ করেছে?

সাইমন: এটাও বলতে পারো।

কিথ: প্রথমে আমি যখন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে সেই ভাষা প্রোগ্রামে ছিলাম, সে সময়ে বইয়ের একটা সেলফে ছিল কয়েকটা ডিভিডি, আর সেই ডিভিডিতে ছিল একটা লালন ফিল্ম। আর তার পাশেই একটা সিডির দোকান ছিল। সে সময় সিডির দোকান তো অনেক ছিল। ওই সিডির দোকানে বাউলের একটা সিডি পেয়েছিলাম। সেই সিডিতে ছিল কয়েকটা গান, কয়েকটা গানের মধ্যে ছিল—'এমন মানব জনম আর কি হবে', আর 'দিনের দিন হলো আমার দিন আখেরি'। ওই সিডিতে কে গেয়েছে আমি ভুলে গিয়েছি। ওটাতে আধুনিকের একটা ভাব ছিল। তবে শুনতে আর শিখতে খুব ভালো লেগেছে। তারপরে আমি নেটে একটু সার্চ করেছিলাম। সার্চ করতে করতে কিছু বাদ দিয়েছিলাম। কারণ আমি তো জানতাম না আসলে কি? লালন কে? একটুকু জানতাম, বাংলাদেশের একজন সাধক। তারপরে একজন জাহিদ ইসলাম নামের ফটোগ্রাফার, এখন মনে হয় নিউইয়র্কে থাকে, সে সময় উনি একটা ফটো এক্সিবিশন করতো, আর আমি একটা দাওয়াত পেয়েছি, আমার আমেরিকান বন্ধু, একজন বান্ধবীর কাছ থেকে তো দাওয়াত পেয়েছি। আর এটা হয়েছিল সেই গ্যোয়েটে ইনস্টিটিউট, জার্মানির একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। ওখানে গিয়ে আমি দেখেছিলাম যে, একজন ছিল কিছু পিছনে। আমার আগ্রহ ছিল যে, আসলে এই মানুষটা কে? কেউ তো তার সাথে কথা বলছে না। এরকম একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সবাই কথা বলছে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে তো তাই হয়। এতে একটা নেটওয়ার্কিং হয়, যেমন—সবাই কথা বলে—আপনি কে? আমি কে? আপনি কি করেন? আপনার কোন দেশ? কোন জায়গার শিল্পী? এসব নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু এই মানুষটা এক কোণে চুপ করে থাকছে, সে কিছুই বলছে না। আর ওর সাথে কথা বলে বুঝতে পারছি যে, সে সংগীত করে আর মাঝে মাঝে শাহবাগে গান গায়। আর ওখান থেকে আমি তার দাওয়াত পেয়েছি। সেই লোকটা হলো—বিধান, একজন সাধক শিল্পী, এখন কুষ্টিয়ায় থাকে। সেই বিধানের সাথে বসে থাকতাম অনেক অনেক দিন শাহবাগ। আমি বারিধারা থেকে অনেক লম্বা একটা জার্নি করে অনেক দিন শাহবাগ এসে সারাদিন থাকি, তারপর ফিরে যাই। আর পার্কেও বসে সেই সময় লালনগীতি একটু শিখতে শিখতে—লালনের নাম, লালনের আসলে কি ভাবধারা—আস্তে আস্তে শিখেছি, সে সময় থেকে। তারপর সেই ধানমন্ডি ২৭ নাম্বারে আমাকে দাওয়াত দিয়েছে, ছাদের উপরে একটা জায়গায় যেখানে যারা কবি, যারা উপন্যাস লেখে, অনেক কিছু, বিভিন্ন কিছু করে তারা ওখানে যাওয়া-আসা করে।

সাইমন: লালন সংসদের দিলু ভাইয়ের ওখানে?

কিথ: হ্যাঁ, দিলু ভাইয়ের ওখানে। যারা শিল্পী তারা ওখানে বিনামূল্যে, ভাড়া ছাড়া থাকতে পারে। সেই সময় আরও অনেক লালনগীতির শিখেছিলাম। কারণ, সেখানে ছিল সেই আব্দুর রব ফকির, বদু মেম্বার—বদরউদ্দিন শাহ, মাঝে মাঝে সেই আনু ফকির, আজিম সাঁইজি, বিভিন্ন লোক ওখানে ফ্রিতে থাকতে পারতো। তারা সেখানে সিদ্ধি সেবা করত আর সে সময় যদিও আমেরিকায় সিদ্ধি খাওয়া নিষেধ ছিল, হতে পারে অসুবিধা ছিলো। আমি খেতাম। খেতে কিছু একটা ধারণা থাকতো যে, আসলে এই সংগীতের মধ্যে কোন ভাব প্রকাশ করা প্রয়োজন আছে? আর কি রকম ভাব

ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে লালন সংসদে কিথ ই. কাম্ভর লালন সংগীত সাধনা, ২০১৩; আলোকচিত্র: সাইমন জাকারিয়া

থাকলে সংগীত ভালো হয় বা একটা সংগীতের মধ্যে কি একটা পরিবেশ আর একটা বোঝার জন্য মন তৈরি থাকতে হয়, তাই না? আর কিভাবে মন তৈরি থাকবে? এটা নিজের একটা ব্যাপার, আর অবশ্যই সিদ্ধি সেবা লাগবে না। প্রত্যেক জনের মধ্যে এই মন তৈরি হওয়ার অবস্থা অন্যভাবে হয়, কারো চা দিয়ে হয়, কারো পান দিয়ে হয়, আবার কারো বসে থাকার মধ্যে এমনিভাবেই এই ভাব আসতে পারে।

সেই সময় থেকে লালনের কুষ্টিয়ায় গিয়ে, নরসিংদীতে গিয়ে—সেই সাধু হুমায়ুন ফকির, অনেক বিভিন্ন রকম সেই সাধুর ব্যবহার, ভাবধারা—এসব কিছুতে মিশতে চেষ্টা করেছিলাম। ভাবতাম যে, এ পথে আমিও হতে পারি। কারণ, সে স্বাগতম তো আমি পেয়েছি। আর বাংলা না শিখলে এই স্বাগতম পেতাম না। তবে আস্তে আস্তে বসে বসে আমি বুঝতে পারছি যে, আমার নিজের সেই ছোটবেলার, সেই আগের সাধনা যা আমি করতাম আর করতে চেষ্টা করতাম, আর এখনো করি। সেই বাউল সাধনার অবশ্যই কিছু একটা মিল ছিল, অদ্ভুত মিল। শেষের কথা এদিকে আমি বলতে পারি যে, সে সময় আমার অনেক অ্যাটেনশন ছিল, হতে পারে লালনের মধ্যে অ্যাটেনশন তো এখনো আছে। আর সেকালেও তো ছিল। আরেটা অ্যাটেনশনটা হচ্ছে যে সংসার একদিকে, আর একটা হচ্ছে সংসার ত্যাগ

করা। যারা তো বিবাহিত, আর যারা একা থাকে, তাই না? এই একটা অ্যাটেনশন ও টেনশন আসলে খুব আদি। ভারতবর্ষের মধ্যে এইসব প্রশ্ন মানে বুদ্ধ, গৌতম বুদ্ধ, সেই কাল থেকে উপনিষদ লেখা রচনা হচ্ছে, সেই কাল থেকে একই রকম হচ্ছে। আর আস্তে আস্তে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে—ঠিক আছে, সংসার ত্যাগ করার কি দরকার, আমারও তো একটা মহাকাজ আছে। আমি করতে পারি, এই দেশ-জীবনেও তো আনন্দ আছে, আর এটা শুধু দুঃখ না। সেই সংসারের মধ্যে আনন্দ, নিজের আনন্দ তো খুঁজে পাওয়া যায়। যদি সংসার চলে, ঠিক আছে, সংসার চলুক। যদি একদম ত্যাগ করার দরকার আছে, ঠিক আছে। তবে, লালন খুব বিশেষ, আমার মনে হয়—কোনদিনই ওনার গানের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত থাকে না যে, ত্যাগ করতে হবে। বা সংসার করতে হবে ... এগুলো সবই খোলা, এটা নিজের ব্যাপার। আর প্রত্যেক গানের একটা পথ আছে, তাই না? একটা গান থেকে অন্য একটা গান। এটাই একটা পথ বা নদীর মত, আর সেটাই বুঝে ভালো লেগেছে। তবে বুঝতে তো সময় লেগেছে।

সাইমন: এটা তোমার একদম প্রত্যক্ষ জ্ঞান। মানে লালনপন্থীদের ভিতরে থেকে বা লালনের গান যারা চর্চা করে তাদের ভিতরে থেকে থেকে তুমি এটা উপলব্ধি করেছ?

কিথ: হু।

সাইমন: এর পরের যে পর্যায়, এবার সে সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। আসলে, লালনপন্থীদের সাথে থেকে যে জায়গাটা উপলব্ধি করা যায় বা বোঝা যায় তার ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে, আর একাডেমিশিয়ান হিসেবে আমরা লালনকে যেভাবে দেখি সেই চর্চা অর্থাৎ একাডেমিক চর্চা আর ক্রিয়েটিভ বা নন একাডেমিক চর্চার ভিতরে ঐক্য বা মিলের পরিমাণ কম থাকে। তুমি কি কখনো কোনো সেই মেলবন্ধন দেখেছো বাংলাদেশে বা তোমাদের দেশের কোনো গবেষণায়?

কিথ: হ্যাঁ, আমি দেখেছি। দুইটা উত্তর আছে। প্রথমে আমি আসলে তোমার জীবনে আমি দেখেছিলাম—সাইমন জাকারিয়া। তুমি তো এরকম করো। তাহলে এটা মিলে, আর এটা তো অসাধারণ। সবাই তো পারে না—সেই ক্রিয়েটিভ আর একাডেমিক কাজ একসঙ্গে মিলিয়ে করতে। অবশ্যই তো আমেরিকায় আছে—সেই যারা তো এন্থ্রোপলজি করে এথনোগ্রাফি, তাই না? এন্থ্রোপলজিকে বাংলায় কি বলে?

সাইমন: বাংলায় নৃবিজ্ঞান বলে।

কিথ: নৃবিজ্ঞান। সেই নৃবিজ্ঞানের মধ্যে একটা কথা আছে—আমি আসলে সেই ক্যারোলা এ্যারিকা লোরেয়ার কাছ থেকে কিছু শিখেছিলাম। কারণ, আমিও তো জানতাম না যে, আসলে আমি কি করছি? আমি কি এথনোগ্রাফি, আমি কি নৃবিজ্ঞান করি? আসলে, ধর্মের ইতিহাস বিষয়ে নিয়ে আমি পিএইচডি কমপ্লিট করেছিলাম। সেই ধর্মের ইতিহাস বা রিলিজিয়াস স্টাডিজ এরকম ধর্মের মধ্যে অবশ্য সেই নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানের একটা দিক আছে। তবে, সবাই করে না। কেউ পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে, কেউ অন্য কাজ, মানে আর্কাইভে কিছু বিশ্লেষণ করে—এরকম করে বা করা হয়। তবে আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পারতাম যে, আসলে ধর্ম বুঝতে চাইলে, ধর্মের মধ্যে যেকোন সাধন বা এবাদত বুঝতে চাইলে অবশ্যই নিজেকে আর নিজের পরিস্থিতি ভালোভাবে বুঝতে হয়। মানে আপনি কে? আপনি কি? আর আপনি এই জগতের মধ্যে, এই ক্ষেত্রের মধ্যে কোথায় থাকেন? আপনার কন্ট্রিবিউশন কি? কন্ট্রিবিউশন কি উপলব্ধি?

ঢাকার ভাবনগর সাধুসঙ্গে বাউল-ফকির সাধকশিল্পীদের সাথে সংগীত পরিবেশন করছেন কিথ ই. কান্ত্র

সাইমন: কন্ট্রিবিউশন মানে বাংলায় অবদান।

কিথ: অবদান। আপনার অবদান কি এই মণ্ডলের মধ্যে, গবেষণার মধ্যে? এই সম্পর্ক নিয়ে আমার আগ্রহ আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে গিয়েছে। গান গাইতে আমার ব্যক্তিগত একটা প্যাশন আছে, অনুরাগ, আসলে খুব খুব ভালো লাগে। গান গাইতে, শুনতে, গ্রামের পরিবেশের মধ্যে থাকতে কথা বলতে ভালো লাগে। এ ব্যক্তিগত আগ্রহের সাথে যে কোন গবেষণা না থাকলে—তাহলে এটা শুধু নিজের একটা পথ। ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে গবেষণার সাথে যুক্ত হলে তাহলে মানুষ মানুষের জন্য একটা প্রকাশ তৈরি করা যায়। আর সেই প্রকাশ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেই প্রকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজের জন্য ভালো একটা ফলাফল হতে পারে।

সাইমন: খুব ভালো বলেছো। এখন বলো, তোমার একটা থিসিস ছিল লালন এবং মনসুর হাল্লাজ নিয়ে। এ ধরনের গবেষণার আগ্রহ তুমি কোথা থেকে পেয়েছিলে? আর এই গবেষণায় তুমি কি প্রকাশ করেছিলে?

কিথ: সেই মাস্টার্স থিসিসের কথা বলছো?

সাইমন: হ্যাঁ। সেটাই।

কিথ: মাস্টার্স থিসিস আসলে তো ছিল 'যোগ-কলন্দার' নিয়ে। তবে কিছু চ্যাপ্টার ছিল—লালনের একটা অংশ, আর হাল্লাজের একটা অংশ। এই ধারণা প্রথমে ক্যারোল সলোমানের গবেষণা, তারপর সাইমন জাকারিয়ার বাসায় গিয়ে একটা বই পেয়েছি, যেটা তুমি আমাকে দিয়েছো—মুহম্মদ এনামুল হকের 'যোগ-কলন্দারে'র একটা বই, আর একজন বন্ধু সেট পাওয়েল আমাকে একটি আর্টিকেল কার্ল আর্নেস্টের Situating Yoga and Sufism. এসব কিছুই মিলে একটা ধারণা তো থাকতো যে, আচ্ছা আমার ছোটবেলা বা স্কুল লাইফ থেকে এখন আমার আগ্রহ ছিল—সেই খেলেমা। আমি বলেছিলাম, এটা অল্টারনেটিভ একটা ধর্ম বা দর্শন বলা যায়। সেই খেলেমার মধ্যে ম্যাজিকের কথা আছে, আর সে ম্যাজিকের মধ্যে যোগ-সাধনা আছে। তবে ইয়োগা আর ম্যাজিকের সাথে মিল আসলে কি? বেশিরভাগ লোক বলবে কোন মিল নেই। ইয়োগা ইন্ডিয়াতে বা বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ায়, আর ম্যাজিক হচ্ছে—ইউরোপ বা যে কোন চিন্তা খ্রিষ্টান থেকে বা ইরান থেকে আগত হয়েছে। এটাই তো একটা আশ্চার্যের ব্যাপার ছিল যে, বাংলাদেশেও সেই একই কাজ হচ্ছে! কিভাবে

মিলবে? আর কিভাবে মিল হয়—সে যোগসাধনা, ধ্যান, ধারণা, আসন—এসব কিছু? আর এক রকমের ম্যাজিক, আর সেই ম্যাজিকটা হচ্ছে—ইউরোপীয় ম্যাজিক তা নয়, এটা সুফি। সুফি সাধকদের কিছু ম্যাজিক আছে। ম্যাজিক মানে আমি স্টেজ-ম্যাজিক সেটা নিয়ে বলছি না। আমি বলছি যে, আসলে এক রকম এবাদত, যে বিজ্ঞানের সাথে এটার একটা মিল আছে, আমি নিজের উপর কিছু পরীক্ষা নিলে বা আবিষ্কার করতে চাইলে তাহলে কোন ফলাফল হবে? আর ফেরেশতার সাথে কথা বলতে চাইলে এটাতে লাভ কি? বা ধর্মের ভাষায় আল্লাহর কত নাম আছে! কত রূপ আছে! প্রত্যেক রূপ আর প্রত্যেক নাম না বুঝলে কিভাবে দুনিয়াকে বুঝতে পারি! সেরকম চিন্তা যোগ-সাধনার সাথে একটা মিল ছিল। ওই দিকে তো আমার আগ্রহ হয়ে গেছে। কারণ, আমি দেখেছিলাম যে, আচ্ছা হতে পারে যে, যেরকম ম্যাজিক বা এরকম কথা আমি খুঁজে পেয়েছিলাম সেই খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে, আর তারপর খ্রিষ্টান ধর্মের বাহিরে... তাহলে কিভাবে বাংলাদেশ একই রকম কথা হচ্ছে? অবশ্য একটা সামাজিক একটা কারণ আছে, রাজনৈতিক একটা কারণ আছে, বিভিন্ন প্যাট্রোন বা কিভাবে বিভিন্ন মসজিদ বা মাজার বা আখড়াবাড়ি বা আস্তানায়—এরকম বিজ্ঞান বিচার করেছে? তবে অর্থ আসলে একই। কে করছে? তারা এরকম সাধন বা এবাদত করছে, আসলে তারা কি চায়, কি করতে চায়? মর্ম আসলে কি? সেটা নিয়ে আগ্রহ ছিল।

সাইমন: তোমার মাস্টার্স থিসিস সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত যদি বল। সবার বোঝার জন্য। মাস্টার্স থিসিসের বিষয়বস্তু কি ছিল এবং তুমি কিভাবে কাজটা করেছিলে?

কিথ: হ্যাঁ, এটা তো 'যোগ-কলন্দার' নিয়ে, এই টেক্সটের লেখক আসলে অজ্ঞাত। তবে কেউ ভাবতে পারে কিছু পাঠ আছে সৈয়দ মুরতাজা আছে, সেই নামে, আর পাকিস্তানের সাথে উনার সম্পর্ক আছে, উনার ভক্তদের কেউ কেউ ওই দেশেও তো আছে। আসলে তো কেউ জানে না যে, আসলে কে লিখেছে? তবে এই 'যোগ-কলন্দার'-এর মধ্যে কিছু কথা আছে—মোকাম, মানে ইংরেজিতে স্টেশন আর কি। আর এই মোকাম আসলে দেহের মধ্যে। দেহের মধ্যে বিভিন্ন একটা ক্রম আছে। আর সেই মোকাম সেই যোগ-সাধনার চক্রের সাথে একটা মিল থাকতো—ওই পাঠে আর দেহতত্ত্ব নিয়ে একটা আলোচনা থাকতো। শুধু এমনি একটা কথা তা নয়, আসলে এটা সে সময়ের চিন্তায় ছিল যে. কিভাবে আমি লম্বা একটা জীবন নিবো? কিভাবে আমি অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারি? তারপর সে নিজেকে নিয়ে এরকম একটা অনুষ্ঠান হয়ে গেছে, তার মধ্যে কিভাবে, কোন দিকে, পূর্বদিকে, পশ্চিমদিকে, উত্তরদিকে, তারপর দক্ষিণদিকে প্রত্যেকের একটা ফেরেশতা আছে, প্রত্যেকের একটা রঙ, প্রত্যেকের একটা ঋতু আছে—বসন্তকাল বা বর্ষাকাল, শীতকাল। এসব কিছু সাধকের দেহের ভিতরে, বাহিরে—এটাও তো একটা মিল আছে বৌদ্ধ-তন্ত্রের সাথে, তারপর বৈষ্ণব-তন্ত্রের সাথে। অনেক কিছুই সব মিলে একটা দরবেশ কলান্দার ফকির এসব দেহে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে আমার আগ্রহ ছিল, আরও শিখতে হবে। কারণ কেউ আমাকে বলিনি যে, এটা আসলে আছে কিনা? আমি আসলে প্রথম থেকে যখন বাংলাদেশ নিয়ে যখন চিন্তাই ছিল, আর আমি শুনেছিলাম, আর সবাই আমেরিকায় শোনে একই রকম যে, বাংলাদেশ তো একটা মুসলমান দেশ, ব্যাস আর কিছু না। তারা বলে না যে, আসলে ইসলাম ধর্মের মধ্যে কত রকম রূপ আছে, কত কিছুই আছে, তার ওপরে শুধু মুসলমান নয়, হিন্দু আছে এদেশে, বৌদ্ধ আছে, যারা কোনো বিশ্বাস মানে কোনো ঈশ্বর নিয়ে বিশ্বাস করে না। তারাও আছে, কত কিছু আছে এই দেশে। তার জন্য এটা আস্তে আস্তে ওই আগ্রহ ছিল যে, আমিও ভাবতাম

যে, আমার ছোট বেলায় সবাইতো বলতো যে, আমেরিকা একটা খ্রিষ্টান দেশ, এ রকম শুনতে শুনতে আমি বড় তো হয়ে গেছি। তবে নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম আস্তে আস্তে আসলে অনেক ধর্মের রূপ আছে, অনেক কিছুই আছে। চিন্তায় আছে এই ধর্মের মধ্যে, অনেক কিছু ধর্মের মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। আসলে কেনও আমরা ধর্মের কাজ করছি? আমরা এদেশের ভাষায়—আমরা নামাজ পড়ি কেন? আমরা এবাদত করি কেন? আর ওই খ্রিষ্টান দেশে আমরা চার্চে যাই কেন? এসব চিন্তা থেকে আসলে সবাই প্রশ্ন করতে চায় না। তবে এরকম বই সেই 'যোগ-কলন্দর', তার মধ্যে এই বিভিন্ন দেশের সাধনার কথা আছে। আমরা বলি এসোটারিজম—এটা গবেষণার একটা ক্ষেত্র, আস্তে আস্তে খুব বড় হচ্ছে ইউরোপে, আর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। আর এরকম প্রশ্ন আসলে বুঝলে—অনেক কিছু সমাজ নিয়ে বোঝা যায়। এটা শুধু এসোটারিজম বা অর্থ বোঝার জন্য তা নয়। অনেক কিছু বোঝা যায় যে, আসলেই তো মানুষ, মানে যারা ধর্মের উপর বিশ্বাস করে, কেন করে? আর সবাই আসলে এই প্রশ্ন করতে চাই না। কারণ প্রশ্ন করতে ভয় লাগে বা প্রশ্ন এভয়েড করতে চাই।

সাইমন: প্রশ্ন করতে জ্ঞানও তো লাগে।

কিথ: ঠিকই বলেছো—প্রশ্ন করতে জ্ঞানও লাগে। জ্ঞান শুধু একাডেমিক জ্ঞান নয়, একাডেমিক জ্ঞান লাগে আবার অভিজ্ঞতার জ্ঞান লাগে। আর ওই দুইটাই আসলে নিতে কিছু কঠিন। আর আমরা মানুষ। আমাদের বেশি দিন নেই এই পৃথিবীতে। ঠিক আছে। আরাম। মানে আমরা তো ছোট জ্ঞান, আমরা অল্প জ্ঞানেই চলে। কেন প্রশ্ন করি? কেন প্রশ্ন করে এ জীবনটা নষ্ট করব? হ্যাঁ!

সাইমন: তুমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছো। আমরা যেটাকে আধ্যাত্মিকতা বা এ ধরনের সাধনার বিষয়টাকে শুধু সাধনার জায়গা থেকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি। যেমন আমাদের বাউলতত্ত্ব নিয়ে চর্চা হচ্ছে। কিন্তু এর সঙ্গে একটা সমাজ-ব্যবস্থাকে বোঝা, এখানকার মানুষের জ্ঞান-সাধনার বিষয়টাকে বোঝা, এখানকার মানুষের শিক্ষা, এখানকার মানুষের চিন্তা এবং সেটা বহু বছর ধরে প্রবাহিত হচ্ছে। তার ভিতরে অনেক ধরনের বৈচিত্র্যও আছে। সেখানে কোন একক ধর্ম-মতের প্রাধান্যও অনেক সময় থাকে না।

কিথ: হু।

সাইমন: এটাতো আমরা দেখছি। যেমন ফকির লালন সাঁইকে নিয়ে এখনও আমরা ডিবেট করছি—উনি হিন্দু কি মুসলিম? কিন্তু উনার গানের একটা অংশ তো পুরোই মুসলমানই মনে হয়, আরেকটি অংশ পুরো হিন্দুয়ানি মনে হয়, আর একটা অংশ পুরোই বৈষ্ণবীয় মনে হয়, আর একটা অংশ পুরোই দেহতত্ত্ববাদী মনে হয়। আসলে উনাকে কোন একক ধর্ম-গোষ্ঠীর চিন্তা দ্বারা উনাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশে তুমি লক্ষ্য করেছ, সেদিন যে প্রোগ্রামে গিয়েছিলে, সেখানেও লক্ষ্য করেছ যে, লালনকে ব্যাখ্যা করতে গেলেও এখন একটা ধর্মমত বা ধর্মকেই দিয়ে বা একটা ধর্মের টুলস হিসেবে ব্যবহার করে লালন শুধুই সুফি সাধক, লালন শুধু ইসলামিক বিষয় নিয়ে সাধনা করেছে। এই জায়গাটা নিয়ে তোমার মূল্যায়ন কি? আমাদের এখানে যে, এই জায়গাটা নিয়ে এক ধরনের চর্চা শুরু হয়েছে—লালনের চিন্তা, গবেষণা, এমনকি মিডিয়াতে লালনের প্রেজেন্টেশন নিয়েও এককেন্দ্রিক অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করা যায়। এক্ষেত্রে তোমার মূল্যায়ন কি? তোমার অবজারভেশন কি?

কিথ: এটা স্বাভাবিক যে, সবাই একটা বক্সে ... তৈরি করতে চায়। তাই না? যে সাইমন তুমি কে? তোমার ধর্ম কী? এটা তো এমারসনেও তো এরকম কথা আছে যে, যারা তাদের জাত বা ধর্ম সহজে প্রকাশ করে, তাদের জন্য আসলে খুব একটা ক্ষতি আছে, একটা লস হতে পারে। কারণ, যে কোন মানুষ তোমার সাথে তর্ক করার সময়, সে তর্কে বা আর্গুমেন্টে আমি আগে থেকে অনুমান করতে পারি। কারণ তোমার জাত একটা প্রকাশ হয়ে গেছে। তাহলে তোমার পক্ষ এখন আমি চিনি। তাই না? আর তুমি কিছু গোপন রাখলে, তোমার সাথে তো তর্ক করতে পারিনা, অনুমান করতে পারি না, আসলে তুমি কি বলবে? তাহলে এটাই আমি দেখেছিলাম যে, লালনে সেই একটা স্ট্রাটিজি আছে। আর আমার মনে হয় যে, এত বেশি জ্ঞান ছিল যে, এডভেটাইজিংয়ে, সবাই তো বলবে না। তবে এডভাটাইজিং কি? বিজ্ঞাপন। তাই না? বিজ্ঞাপন মানে এই প্রত্যেক গানে যেমন তুমি বলেছিলে—একটা গান হচ্ছে পুরো মুসলমান রূপে, যারা মুসলমান তারা এ গান শুনে ভাববে—ও হ্যাঁ, অবশ্যই লালন একজন মুসলমান। এটাও একরকম একটা বিজ্ঞাপন। কারণ, যারা শুনে একটা আকর্ষণ তৈরি হয় তাদের মনে। তারপর শুনে শুনে হতে পারে অন্য একটা রূপের গান একটু পরে শুনে—একটু রিলাক্স ফিল হবে। কারণ প্রথমে তো মধ্যে একটা একটা দেওয়াল আছে যে, না, আমি কোনো হিন্দু গান শুনবো না। আমি শুনতে চায় না। শুধু আল্লাহর নামের গানগুলো শুনবো, আর কিছু শুনবো না। তবে লালনের যখন একটা আল্লাহর গান হয়, তখন আস্তে আস্তে এরকম তো রূপের পরিবর্তন হয়, যেমন—আল্লাহ থেকে আলেক সাঁই, আলেক সাঁই থেকে ঈশ্বর, ঈশ্বর থেকে সৃষ্টিকর্তা, এরকম নামে আস্তে আস্তে একটা ডিকনস্ট্রাকশন হয়, সে বানানো বা তৈরি করার কৌশলের উপর একটা ছেড়ে দেওয়া হয়।

সাইমন: পরবর্তীকালের শিল্পী-গায়করাও দেখা যাচ্ছে লালনকে পরিবর্তন করছে, খুব সহজ ভাবে। যেমন—লালনের গানে আছে, 'সাঁই কে বোঝে তোমার অপার লীলে'। এই গানটি মূলে শুরু হয়েছিল 'সাঁই' কথাটি দিয়ে। কিন্তু এখন আর কেউ এই গান 'সাঁই কে বোঝে তোমার অপার লীলে' গাইছে না, এখন সবাই গাইছে, 'আল্লাহ কে বোঝে তোমার অপার লীলে"।

কিথ: এটা তো ছিল সেই 'যোগ-কলন্দারে'র সময়েও। আমি সেই পাণ্ডুলিপির মধ্যে তো কেউ তো 'প্রভু' লিখেছে। আবার সেই 'প্রভু' লেখার জায়গায় কিছু পাঠ আছে যে, 'আল্লাহ' লেখা। তাহলে তো 'প্রভু', 'আল্লাহ' এরকম তো সেই কালে ২০০-৩০০ বছর আগে একই রকম, এটাও তো ছিল।

সাইমন: তার মানে যে ওটার ভোক্তা হচ্ছে বা যে ওটার প্রচারক হচ্ছে, সে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে, তার সুবিধামতো অন্য একটা পাঠ তৈরি করছে, বা আসল পাঠটি পরিবর্তন করে দিচ্ছে?

কিথ: হ্যাঁ। আমরা তো মানুষ, আমরা দলের মধ্যে থাকতে চাই। যেমন—তুমি ব্রাজিল, আমি আর্জেন্টিনা। তোমার দলেও তো থাকতে হবে, ঠিক আছে? তবে লালন তো আসলে মনে হয় বলছে যে, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা সব ফুটবল। এটাতে বিভিন্ন দল থাকুক, এটা সব সময় সবসময় থাকে। আমরা মানুষ, এ দল তো থাকে। তবে এ দলের মধ্যে অবশ্যই কিছু মিল আছে।

সাইমন: এবার আসি *সিটি অফ মিররস: সংস অফ লালন সাঁই* প্রসঙ্গে, যে কাজটা আমরা দুজন মিলে সম্পাদনা করেছি। কিন্তু কাজটা আমাদের দুইজনের মৌলিক কাজ নয়, কাজটা আরেকজনের, সেটা ক্যারোল সলোমনের। ক্যারোল

সলোমনের এই অনুবাদ সম্পাদনার ক্ষেত্রে তুমি একজন আমেরিকান হয়ে অন্য একজন আমেরিকানের কাজকে এবং তুমি আবার একই সঙ্গে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ক্যারোলের মতোই অনেকটা বুঝেছ, ক্যারোল গান গাইতে পারতেন কিনা আমি জানিনা, কিন্তু তুমি অসাধারণ গান গাইতে পারো বাউল গান। যদিও ক্যারোলের হাতে একতারা নিয়ে একটা ছবি দেখেছি বাউলদের সাথে। হয়তো তিনিও দুই একটা গান গাইতে পারতেন। সেই জায়গা থেকে ক্যারোল সলোমনের লালন গবেষণার যে কাজটা, তার প্রধান গবেষণা, যেটা তিনি প্রকাশ করে যেতে পারেননি, সেটা যখন তুমি গভীরভাবে দেখলে তখন তোমার কি মনে হয়েছে—ক্যারোল কি আসলে প্রকৃত অর্থে আমাদের একাডেমিক বাউল-লালন গবেষণার যে ধারা সেই ধারাকে অতিক্রম করে, গবেষণায় আগে এক ধরনের একটা গলদ ছিল, আগে বাউলদের কোন কথা তেমনভাবে কখনো শোনা হয়নি, মানে আমাদের ইন্টেলেকচুয়ালরা নিজেদের কথাগুলোকে শুধু ব্যাখ্যা করেছে নিজেদের মন মত, হয়তো তারা শুনেছেন কিন্তু কখনোই তারা বাউলদের কথাগুলোকে গুরুত্ব দেননি বা প্রকাশ করেননি—যে এটা খোদাবক্স সাঁইয়ের কাছ থেকে নিয়েছেন, বা আব্দুল করিম শাহের কাছ থেকে নিয়েছেন, বা উনাদের সঙ্গে আলোচনার সূত্রে গবেষক এরকম একটা ভাব পেয়েছেন, সেটা তেমনভাবে কখনো প্রকাশ করেননি। কিন্তু ক্যারোল সলোমনের রিসার্চের ভিতরে একটা এন্থ্রোপলিজিক্যাল পারস্পেক্টিভ আছে। এই জায়গাটা লালন গবেষণার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটার কন্টিনিউটি ধরে রাখা কতটা প্রয়োজন?

কিথ: এটা অবশ্যই আমরা দেখি। ক্যারোল সলোমনের গবেষণা এত বেশি অসাধারণ যে, কত বিভিন্ন রকমের দিক আছে। আমার মনে হয়—এখনো, বর্তমানে তো সবাই অপ্রিসিয়েট করে না। কারণ অ্যাপ্রিসিয়েট করতেই পারে না। আসলে বাংলাদেশে সাধকদের কাছে থাকলে বা পুরানো পাণ্ডুলিপি নিজে দেখলে তারপরে অ্যাপ্রিসিয়েসন তৈরি হয়ে যাবে। আসলে তো কত কাজ দরকার ছিল এসব কিছু জানতে। আমার মনে হয়, আমি শুনেছি, উনার সাথে আমার কখনো দেখা হয়নি। উনার স্বামী রিচার্ড সলোমন আমার সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক, যখন আমি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় ছিলাম তখন উনার কাছ থেকেই শুনেছি যে, ক্যারোল একটা দীক্ষাও পেয়েছিলেন। তার জন্য অবশ্যই দীক্ষা পেলে, যদিও তা গোপন রাখতেন, এক রকম বলা যায় তিনি গবেষক-সাধিকা পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। তাঁর গবেষণার দিক—এটাও অনেক অসাধারণ। কারণ আমার মনে হয়, সাধুদের কাছে গিয়ে শুধু তাদের উত্তর সংগ্রহ উনার কাছে প্রয়োজন ছিল না। অবশ্যই তাদের কথা, তাদের অর্থ ও তাদের জ্ঞান সব সময় উনার গবেষণার মধ্যে কেন্দ্রে ছিল, এটা সেই কেন্দ্রীয় ক্যারেক্টার, একটা মূল জায়গা ছিল, এটা সব সময় বোঝা যায়। তবে শুধু এই জায়গায় থাকেননি। আসলে এই জায়গার কাছ থেকে একটু বাইরে গিয়ে 'যোগ-কলন্দার', শেখ জাহিদের 'আদ্য পরিচয়', তারপর যে সুফি-সাহিত্য, তারপর হিরণ্যগর্ভ, বিভিন্ন হিন্দু পুরাণ, রাধা-কৃষ্ণের পদাবলী, বৈষ্ণব সহজিয়া, মানে এসব চিন্তার মধ্যে যে বইগুলো উনার হাতে পেয়েছেন, এই বইগুলো খুব গভীরভাবে পড়ে ভালো একটা গবেষণার দিক তৈরি করেছেন। আমার মনে হয় এতে তো অবশ্যই তো বাংলাদেশের জন্য একটা লাভ। ভবিষ্যতে যারা এদিকে গবেষণা করবে তাদের জন্য লাভ। তবে মনে হয়, এখনো সবাই আবিষ্কার করতে পারেনি, খুঁজে পাইনি। মানে কি? এটাও তো একটা প্রশ্ন।

সাইমন: তুমি জানো, ক্যারোল কত দুঃসাহসী কাজ করেছেন! যেমন—একটি গানের কথা বলি, গানটা খুব জনপ্রিয়, তুমি নিজেও গিয়েছো—'ধন্য ধন্য বলি যারে'।

আজকাল এই গানটি সবাই গাইছে—'ধন্য ধন্য বলি তারে'। কিন্তু তিনি এই গানটার যে পাঠ ক্যারোল সলোমন দিয়েছেন সে পাঠটি হল: 'ধন্য ধন্য বলি যারে/বেঁধেছে এমনও ঘর শূন্যের উপর পোস্তা করে/ঘরে সবেমাত্র...'। এরপর ক্যারোল সলোমনের পাঠেই শুধু আছে- 'ঘরের সবেমাত্র দুটো খুঁটি'। তুমি নিজে যখন ক্যারোলের অনুবাদের ভিত্তিতে ইংরেজিতে গেয়েছো আমি খেয়াল করেছি তুমি 'দুটো খুঁটি'ই গেয়েছ। কিন্তু বাংলাদেশ এবং ভারতের কোনো গায়ক এই গানটির এই পাঠটি করেনি। এই পাঠটি আমি শুধু দেখলাম ক্যারোল সলোমানের বইয়ে আছে। খোদাবক্স সাঁইয়ের সংগ্রহে যে পুরনো পাণ্ডুলিপি আছে, সেই পাণ্ডুলিপিতেও এই পাঠটি আছে—'দুটো খুঁটি'। তিনি এই গানটির পাঠগুলো খুব গভীরভাবে দেখেছিলেন। তাঁর হাতেলেখা যে পাণ্ডুলিপি আছে সেখানে এই গানটির পাঠগুলো নিয়ে পর্যালোচনা রয়েছে। বিভিন্ন প্রিন্টেড মেটেরিয়ালে কীভাবে 'দুটো খুঁটি'র জায়গায় 'একটি খুঁটি' হয়েছে, তা তিনি হাতেলেখা পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ করেছেন। তাঁর হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি দেখলে বোঝা যায়, তিনি 'দুটো খুঁটি' কেন নিয়েছেন? তার চমৎকার ব্যাখ্যাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এরকম দুঃসাহস নিয়ে আমাদের এখানে কোন গবেষককে কখনো কাজ করতে দেখিনি। প্রচলিত একটি বিষয় যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, সেই প্রতিষ্ঠিত জায়গা থেকে সরে এসে কেউ সমাধান বা ব্যাখ্যা দিতে চায় না। ক্যারোলের এই জায়গাটা নিয়ে তোমার কথা শুনতে চাই। তোমার কাছেও কি এমনটা আরো চোখে পড়েছে?

কিথ: হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আসলে উনি অনেক খেয়াল রেখেছেন যে, সাধু আর সাধিকা যারা তারা শুধু গান গায় না, তাদের কাছেও খাতা আছে। বেশিরভাগ গায়কদের কাছেই ডাইরি আছে, খাতা আছে, আর তারা লিখে যদিও, কিন্তু মুখে মুখে মুখস্ত করে

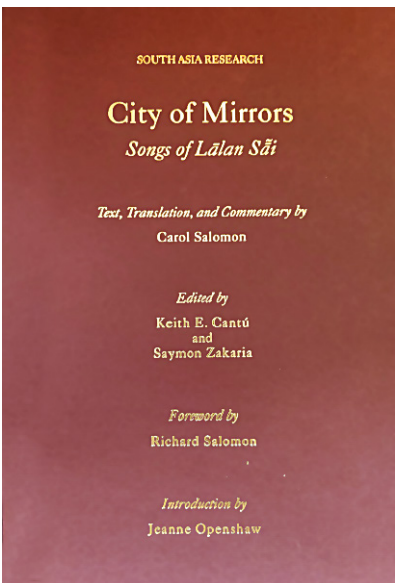

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত সিটি অব মিরোরস : সংস অব লালন সাঁই *গ্রন্থের প্রচ্ছদ এবং গ্রন্থটির অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার ক্যারোল সলোমন*

গান গায়। অবশ্যই একটা পাঠ আছে একটা গান শেখার জন্য। অবশ্যই মুখস্ত করতে হয় প্রথমে। একজন বিভিন্ন জায়গা থেকে—বিভিন্ন সাধুসঙ্গ, বিভিন্ন আঁখড়াবাড়িতে গিয়ে, ইন্টারনেটের আগে, বই প্রকাশের আগে, সবাই এরকম লিখতো। তাই না? অনেক অনেক ভালো একটা ফিলোলজি। বেশিরভাগ যারা ফিলোলজি পড়ে, তারা ভাবে এটা শুধু সংস্কৃত ভাষায় বা ল্যাটিন ভাষায় অনেক অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থাকে। শুধু তা নয়, আসলে বাংলা আধুনিক বা মধ্যযুগে এত এরকম পাণ্ডুলিপি লেখা হয়েছে! এরকম জগতেরও একটা ফিলোলজি অনেক দরকার আছে। অনেক অনেক কাজে হয়। কারণ শব্দের অর্থ, শব্দের পাঠ, মুখে মুখে একটা শব্দ আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয়। তবে লেখা পরিবর্তন হয় না, একজন কিছু একটা লিখলে ওই লেখাই থাকবে। যতদিন কাগজে লেখা থাকবে ততদিন একই লেখা থাকবে। তার জন্য ওই এলাকার হাতেলেখা রচনাগুলোও একটা রেকর্ড হিসেবে গণ্য করতে হবে। ক্যারোল এই রেকর্ডে খেয়াল রেখেছে। শুধু গান গাওয়ার এরকম একটা বিষয় না। অবশ্যই এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ লেখার মধ্যেও ভুল থাকে। মাঝে মাঝে ঠিক ভাবে লোকজন শুনে না, তখন তো আলাদা ভাবে লিখে। উনি খেয়াল রেখেছেন যে, আসলে সব কিছু মিলে আমরা গবেষণার কাজ করব। এটা অনেক অসাধারণ। কারণ বিভিন্ন মেথড ব্যবহার করলে, সবকিছু মিলে একসাথে এরকম গবেষণা করলে অনেক ভালো হয়।

সাইমন: আমি আশ্চর্য হয়েছি—ক্যারোলের এই গানটার পাঠ নির্মাণ দেখে! যে গানটি নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করছি, ক্যারোলের করা অডিও রেকর্ডিংয়ের ভিতরেও গানটি পেয়েছি। এতে খোদাবাক্স সাঁইয়ের কণ্ঠে গানটিতে 'দুটো খুঁটি'ই আছে। ক্যারোল সলোমনের রেকর্ডিংটা শুনলে দেখবে—খোদাবক্স সাঁই একটা বাচ্চা মেয়েকে এই গানটা শেখাচ্ছেন। এই রেকর্ডিংয়ের ভিতরে ওই বাচ্চা মেয়েটা গাইছে 'দুটো খুঁটি', খোদাবক্স সাঁই একই সঙ্গে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন। তুমি যেটা বললে যে, খাতায় অনেক সময় ভুল থাকে, আবার মৌখিক ভাষ্যেও ভুল থাকে। কিন্তু ক্যারোলের গবেষণায় দেখা যায়, খাতা এবং মৌখিক ভাষ্য একই সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন। আসলে তুলনামূলক পদ্ধতিতে তিনি প্রামাণ্য-পাঠ নির্মাণ ও গ্রহণ করতেন। একমুখী পাঠ তিনি কখনো গ্রহণ করেননি। এখন তোমার সর্বশেষে যেখানে আসবো, সেটা তোমার মূল গবেষণা প্রসঙ্গে। আমরা জানি, এতক্ষণ যে বিষয়ে আলোচনা করলাম—এটা তোমার মূল গবেষণা না। তোমার গবেষণার মূল জায়গা হলো ধর্মতত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্বের গবেষণায় তুমি এরমধ্যে পিএইচডি ডিগ্রি করেছো। তোমার পিএইচডি ডিগ্রির বিষয় এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যদি কিছু বলো।

কিথ: সভাপতি স্বামী একজন তামিল সাধক, যোগী, তারা বলে স্বামী, (হেসে বলেন) হাজবেন্ড না, তবে স্বামী। ভারতের তামিল থেকে বড় হয়ে লাহোর, উত্তর ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে একটু ঘুরতে গিয়েছেন। আর একটা শিব-রাজযোগ বিষয়ে অনেক রচনা করেছেন। শিব-রাজযোগ একটা যোগ-সাধনার রূপে দেহতত্ত্ব বিষয়ের সাথে অনেক মিল আছে। এই সভাপতি স্বামী ওই কালের বিভিন্ন ইউরোপীয় মানুষ, আমরা বলতে পারি অকাল্টিস্ট বা অকাল্ট (Occult) লেখক, তাদের সঙ্গেও কিছু মিশেছে। যেমন থিওসফিক্যালের একটা সোসাইটি সেই সময় অনেক জনপ্রিয় ছিল, অনেক বিখ্যাত ছিল। এখন অতটা বেশি না, তবে এখনো আছে। তবে সেই সময় অনেক বড় ছিল। যারা ইউরোপ দেশ থেকে ভারতবর্ষে, বাংলাদেশে সেকালে এসেছিল। এদের কারো কারো এদেশের আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে একটা আগ্রহ ছিল, আরো শিখতে চায়। আর এই আগ্রহ থেকে বিভিন্ন বই প্রকাশ শুরু হয়ে

যায় সেই ব্রিটিশের কালে। সেই সময় মানে ওই দিনকালের সাধু বা স্বামী বা এরকম যারা ছিলেন, তাদের কাছে কিছু বুদ্ধি থাকতো। তারা ভাবলো যে, আচ্ছা এখন তো বই প্রকাশ হচ্ছে। তবে আমাদের পক্ষ থেকে তো আমরাতো বই...

সাইমন: প্রকাশ করি না।

কিথ: করি না। তবে প্রকাশ করতে পারি। আমরা প্রকাশ করলে আমরা কি নিয়ে লিখব? সভাপতি স্বামী তো এরকম। যদিও উনি কোনদিনও সেই ফিওসফিক্যাল সমাজে জয়েন করেননি। উনি নিজের একটা মন্ডল তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। আর বিভিন্ন ভাষার মধ্যে এ বই প্রকাশ করেছে—বাংলা ভাষায়, তামিল ভাষায়, হিন্দি ভাষায় বা হিন্দুস্তানি মানে উর্দুর সাথে একটি মিল ছিল, আর তেলেগু ভাষায়, আর সংস্কৃত ভাষায়। বিশেষ করে সংস্কৃতের সঙ্গে অনেক মিল ছিল। উনার সম্পাদক একজন বাঙালি মানুষ ছিলেন, যিনি লাহোরে বসবাস করতেন। উনার বাবা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলা থেকে চলে গিয়েছেন সেই ব্রিটিশের সময়ে।

সাইমন: উনার নাম কি ছিল?

কিথ: হ্যাঁ, বাঙালি সম্পাদকের নাম শ্রীশচন্দ্র বসু। এই বসু অনেক ইংরেজি বই লিখেছেন। সংস্কৃতের একজন পন্ডিত ছিলেন। অনেক বই প্রকাশ করেছেন—ইয়োগা আসলে কি? তন্ত্র কি? এখনো তো বর্তমানে সব জায়গায় মানে আমেরিকাতে একটা বুক স্টরে গেলে বা নেটে সার্চ করলে আসলে বেশিরভাগ অনুবাদ সেই যোগ-সাধনা নিয়ে, যেমন—শিবসংহিতা এটা খুব জনপ্রিয় একটা বই যোগের ক্ষেত্রে। উনার অনুবাদ তাদের কাজে লেগেছে। এখন বর্তমানে যারা আন্তর্জাতিক গবেষক তারা নতুন এডিশন, নতুন বই প্রকাশ করছে। তবে সেই সময় শুধু একটা অনুবাদ পাওয়া যেত, আর এটা তো সেই শ্রীশচন্দ্র বসুর। সেই শ্রীশচন্দ্র বসুর কিছু সময়ের জন্য গুরু সেই সভাপতি স্বামী। এরকম বই প্রকাশ থেকে অন্যরকম একটা দিকে চিন্তা গিয়েছে ইউরোপ-আমেরিকায়। যেমন আগে বলেছিলাম থেলেমার কথা। একজন তো ছিল এই ম্যাজিকের উপর অনেক বই রচনা করেছেন, উনার নাম অ্যালস্টার ক্রোলি। আলস্টার ক্রোলি দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুতে গিয়ে সেই সভাপতির স্বামীর সাথে বই পেয়েছেন। এই যোগ-সাধনার বইয়ের সম্পাদক ছিলেন সেই শ্রীশচন্দ্র বসু। তাহলে শ্রীশচন্দ্র বসুর নামও তো উনার (ক্রোলির) চিন্তায় ছিল। তবে এই যোগ-সাধনার চিন্তা ম্যাজিকের চিন্তার সাথে মিলছে। আমি জানি যে, বারবার আমি এভাবেও তো বলছি, এটা খুব অদ্ভুত! একদম একটা সুফি সাধনার মত! মানে যারা সুফি সাধনা করে, দু তিনশ' বছর বছর আগে বাংলাদেশে এসে যোগ-সাধনার সাথে তাদের এবাদতের মিল করেছে। আমার মনে হয় এটা প্রায় একই একটা কাজ। যেভাবে আলেস্টার ক্রোলি বা অন্য এ রকম অকাল্ট লেখক সভাপতির একটা যোগ-সাধনার কথা পেয়ে, তারপর ম্যাজিকের সাথে একটা মিল দেখত।

সাইমন: মানে তুলনা করেছিল?

কিথ: হ্যাঁ, তুলনা করেছিল। এটা শুধু তারা নয়, সভাপতি স্বামীও তো করেছে, এসব ব্যবহার করেছে, অকাল্ট করেছে। অকাল্ট মানে গুপ্ত বা বাতুন। এটা আসলে কি? সভাপতি স্বামীর উদাহরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে মনে হয়। কারণ উনি তো তৈরি করেছেন—এই প্রসেস, এই তুলনা। এই দরজা একটু খুলেছে। আগে তো বেশি খোলেনি, তবে উনি খুলেছেন। এই ইতিহাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটাই এখন আমি সেই বইয়ের উপর কিছু কাজ করছি, সম্পাদনা করছি, আরও ওই দিকে তো করছি। সেই তামিল দেশে ওনার গুরু কে? বা প্রসঙ্গ কি? উনার আগ্রহ ছিল একজন ঋষির উপরে—অগস্ত ঋষি। একটা পাহাড় তামিল দেশেও আছে খুব বিখ্যাত। সেই পাহাড়ের

নাম—অগস্ত পাহাড়। আর সেই সময় এটাতে আখড়াবাড়ি ছিল। ওখানে গেলে অবশ্যই সেই সিদ্ধ মানুষ বা স্বামীরা থাকে। এই যোগী মন্ডলের মধ্যে অবশ্যই অনেক মিল দেখবে বাংলাদেশের সাধুদের সাথে। অবশ্যই পার্থক্য আছে কিছু কিছু ভাষায়, আর কিছু ব্যবহারে। যেরকম আবার আমি বলতে পারি, এটা রংধেনুর অন্য একটা রঙ। তবে আসলে ব্যবহার, যেভাবে খায়, যেভাবে বসে, যেভাবে কিছু তাদের বিশ্বাস অর্জন করে। সহজে তাদের বিশ্বাস নেবে না, সাধারণ মানুষের মাঝে সব সময় মিশে না। আসলে খুঁজে পেতে হয়। আর এরকম একটা সমাজ আছে, দক্ষিণ ভারতেও আছে, অন্য ভাষায়। সেই সমাজ থেকে সভাপতি স্বামী উত্তর ভারতে গিয়ে এরকম একটা প্রকাশ করেছে। আর শেষের কথাটা হচ্ছে, আমার মনে হয় যে, এরকম প্রচার করা থেকে আমরা কি জানতে পারি? আসলে জানতে পারি যে, এক দেশের মধ্যে সব উত্তর, সব ইতিহাস পাওয়া যায় না। আসলে এরকম সম্পর্ক নিয়ে একটু গবেষণা করতে হয়। যেমন—লালন অবশ্যই বাংলাদেশে তো থাকতেন, আর উনার ভাষাও তো বাংলা। তবে সাধুসঙ্গ শুধু বাংলাদেশে নয়, ইন্ডিয়ায়ও তো আছে। বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তো আছে। তাহলে ওই সম্পর্ক কি? আসলে কেন বা কিভাবে? এসব কিছুর উপরে আমার আগ্রহ, আস্তে আস্তে থাকতো। শুধু সংস্কৃত ভাষায় থাকলে এরকম বোঝা যায় না। সংস্কৃত ভাষা নিয়ে আমার অনেক সম্মান আছে। তবে পড়াশোনা করেছিলাম। তবে আসলে যেভাবে তারা বলে ভার্নাকুলার ভাষা, প্রচারিত ভাষা, যেমন- বাংলা বা তামিল, হিন্দি, এরকম প্রচারিত ভাষার উপর যেমন ক্যারোল সলোমন বা তুমিও তো করছো...। এরকম কাজ অনেক অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমার মতে, আরও সম্মান দেওয়া লাগবে।

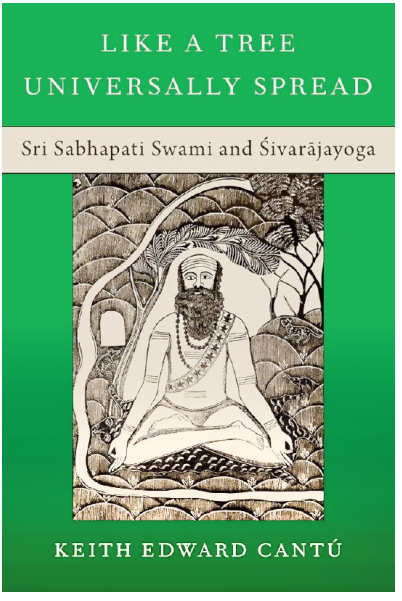

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত লাইক এ ট্রি ইউনিভার্সিলি স্প্রিড : শ্রী সভাপতি স্বামী অ্যান্ড শিবরাজযোগ *গ্রন্থের প্রচ্ছদ এবং গ্রন্থকার কিথ ই. কান্তু*

সাইমন: তোমার পিএইচডি থিসিস এখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হচ্ছে (সাক্ষাৎকার গ্রহণ-কালে প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন ছিল বর্তমানে গ্রন্থটি প্রকাশিত)। এটার প্রসেস সম্পর্কে একটু বল।

কিথ: এর প্রসেস? বই লেখার বিষয়ে?

সাইমন: আসলে আমি জানতে চাচ্ছি, তোমার মূল থিসিস (মানে পিএইডির গবেষণা-অভিসন্দর্ভ) আর বই—এই দুইটি সংস্করণের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে?

কিথ: একটু আছে। যেমন—বই প্রকাশ করার সময় সেই থিসিসের অনেক নতুন চ্যাপ্টারের নাম আমি দিয়েছিলাম, কিছু রূপের পরিবর্তন করেছিলাম। অনেক নতুন ছবিগুলো দিয়েছিলাম। যেমন—সভাপতির বইগুলোর মধ্যে অনেক দেহতত্ত্ব ডায়াগ্রাম আছে, অনেক ছবি আছে। খুব সুন্দর ছবি। সেটাও আমি কষ্ট করে দিয়েছি বইয়ে। কিছু কিছু নতুন কথা, নতুন খবর আমি শিখেছিলাম, সেটাও আমি দিয়েছি বই প্রকাশের সময়।

সাইমন: এই নতুন বইয়ে?

কিথ: হ্যাঁ, এই নতুন বইয়ের মধ্যে। তাহলে অবশ্যই মিল আছে। কারণ থিসিস তো হচ্ছে ৫-৬ বছরের কাজ। তাহলে অবশ্যই পাঁচ ছয় বছরের একেবারে তো ছেড়ে দিতে পারি না। তার জন্য অবশ্যই একটাতে মিল আছে।

সাইমন: তার মানে অনেক আপডেট নলেজ তুমি যুক্ত করেছ?

কিথ: অনেক আপগ্রেড নলেজ আছে। আমার এডভাইজারও একবার বলছেন যে, আসলে কেউ তো পিএইচডি থিস পড়ে না। তার জন্য বেশিরভাগ পিএইচডি থিসিস থাকে না, এটা কোন ব্যাপার নয়। কারণ, আসলে লোকজনে বই পড়ে। বেশিরভাগ লোক নয়, শুধু স্পেশালিস্টে পিএইচডি থিসিস পড়বে। তবে বই যখন সেলফে, যখন দোকানে, যখন নেটে, আমাজনে বা যে কোনো দোকানদারের কাছে কেউ যদি দেখে তাহলে ভাববে, ও এটা তো বই! তার জন্য লোকে সেটা পড়ে।

সাইমন: আরেকটা জিনিস জানতে চাই, এখন তুমি কি কাজ করছ?

কিথ: আসলে মাঝখানে একটা পোস্টডক ফেলোশিপ শুরু করেছিলাম, সেই ফ্রেডরিক আলেকজান্ডার ইউনিভার্সিটির এয়ারলঙ্গিনে, একটা প্রজেক্ট হচ্ছে—এসোটারিজম। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সারা বিশ্বের মধ্যে এই এসোটারিজমের ক্ষেত্রে বা গোপন তত্ত্ব মানে কিভাবে আমরা তুলনা করতে পারি? আসলে তুলনা করা যায়? বা এটা তো একদম পার্থক্য মানে আলাদা আলাদা? এক দেশে আলাদা আলাদা, আরেক দেশে আলাদা আলাদা সাধনা আছে, আমরা তো তুলনা করতে পারিনা। এটা একটা প্রজেক্ট চলছে, ফান্ডিং তো পেয়েছি। পোস্টডকে তো করছি। আমার প্রজেক্ট করছি—যোগ-সাধনায় উপরে। কারণ এটাই একটা কানেকশন, একটা সম্বন্ধ—আমার সেই মাস্টার্সের কাজ সেই যোগ-কলন্দার, লালন, হাল্লাজ—এইসব কিছুই মিলে, এই সভাপতি স্বামী। এটা সত্য হচ্ছে যোগ-সাধনা। আর শুধু স্টুডিও ইয়োগা, তা নয়। এটাও তো একটা জায়গায় আছে। ঠিক আছে। তবে যোগ-সাধনা আসলে কি! এটা তো সাধারণ একটা স্টুডিও পাবে না। এটা তো সেই সাধনা, সেই সাধুসঙ্গের মধ্যে তো পাওয়া যায়, বা প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে, বিভিন্ন প্রচলিত ভার্নাকুলার ভাষায়ও পাওয়া যায়। সেই প্রজেক্টে একটু কাজ করা হচ্ছে এক বছর ধরে। মূল আসলে এরকম—অকাল্ট লেখক, যেমন—আলস্টার ক্রোলি, বা থিওসফিক্যাল সোসাইটি, তাদের আসলে মূল সোর্স...। সোর্সকে কি বলে বাংলায়?

সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর ড. কিথ ই. কান্তর সাথে সাক্ষাৎকার গ্রাহক ড. সাইমন জাকারিয়া, ২০২২

সাইমন: সূত্র।

কিথ: সেই সূত্র আসলে কি? কোথা থেকে তাদের তত্ত্ব পেয়েছে? এই কাজ করছি, যেমন—সেই শ্রীশচন্দ্র বসু, উনি যদি না থাকতেন তাহলে তাদের কল্পনাতেও থাকতো না। কিভাবে থাকতো? বা সেই সভাপতি স্বামী রচনা না করলে সেই দেহতত্ত্ব নিয়ে, রাজযোগ নিয়ে কিভাবে জানতো? তবে এখন, বর্তমানে এরকম ইউরোপীয়র নাম তো অনেক প্রসারিত হয়, যেমন—ক্রোলি বা এরকম লেখক, থিওসফি বা এরকম লেখক তো খুব প্রচলিত, অনেক অনেক বই এই মানুষের উপরে লেখা হয়ে গেছে। কত রকম ইতিহাস! কত রকম বই আছে! তুমি কি সেই সভাপতি স্বামী নিয়ে কোনো বই দেখেছ কোনোদিন! একটা রিসার্চ করলে দেখবে এখনো শ্রীশচন্দ্র বসুর কোনো বায়োগ্রাফি হয়নি, প্রকাশিত হয়নি, আশ্চর্যের! কত বায়গ্রাফি আছে হেলিনা প্রোভাস্কির, তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটির ফাউন্ডার একজন। উনার লাইফ নিয়ে হতে পারে ১০-১৫ বই, বায়োগ্রাফি আকারে প্রকাশিত হয়ে গেছে। তবে এ রকমের সূত্র, আসলে এরকম প্রচারক, এর লেখক, তাদের জীবন খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং! কারণ, তারা তো শুধু বই পড়তো না। তারাও তো ওই কালে সাধুসঙ্গের মধ্যে তো মিশেছে।

সাইমন: এটা খুবই দুঃখজনক! শুধু শ্রীশচন্দ্র বসুই নয়, আরেকজন ছিলেন আমাদের এখানে সতীশচন্দ্র রায়। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি গবেষণার প্রবর্তক ও প্রথম গবেষক-লেখক। তিনি অনেক কাজ করেছেন, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু* নামে বৈষ্ণব পদাবলীর সংকলন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *হরিবংশ*-এর তিনি সম্পাদক। দুঃখজনক হলেও সত্য গ্রন্থটি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজের (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি গবেষণার স্বার্থে পেশাগত অধ্যাপনা ছেড়ে দেন। সার্বক্ষণিক গবেষণার কাজেই

মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনী সম্পর্কে তেমন কেউ কিছু লেখেনি। ২০১৯ সালে প্যারিসের ন্যাশনল বিবলিওথেক ন্যাশনাল ডি ফ্রান্স [বিএনএফ]-এ আমার একটা প্রেজেন্টেশন ছিল, সেখানে আমি তাঁর জীবনী তুলে ধরে ছিলাম। আমার ইচ্ছা আছে উনার জীবনীটা প্রকাশ করা। উনার শত শত প্রবন্ধ রয়েছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি সংগ্রাহক-সম্পাদক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পর্কে যেভাবে আলোচনা হয়েছে সেভাবে উনার কথা উঠে আসেনি। অথচ বাংলাদেশের পাণ্ডুলিপি গবেষণার জন্য তিনি একজন পায়োনিয়ার ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর জীবনী নিয়ে একটা বড় প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আছে। এবার আমি তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাই?

কিথ: ভবিষ্যতের পরিকল্পনা হচ্ছে—এরকম কাজ আমি করতে থাকবো। স্থায়ী একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পজিশন পেলে গবেষণার দিকে আরো সময় পাবো। তবে এই জায়গায় আমি থাকবো—সেই যোগ-সাধনা, তন্ত্র, এসোটারিজম, অ্যালকামি—এরকম জায়গায় আমার মূল আগ্রহ। আমার মনে হয়, এই কাজেই থাকবো। যদিও লোকে অনেক সময় বলে—'কিথ, নতুন একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন।' (হেসে) হতে পারে, নতুন কিছু করব। তবে এই জায়গায় আমার মনে হয় আরো কাজ বেশি আছে। যেমন তুমি ইঙ্গিত দিয়েছো—এটা আমার মহাকাজের সাথে জড়িত, সম্পর্ক আছে এর। তার জন্য অবশ্যই মন যেভাবে থাকে, সেভাবে থাকলেই ভালো হয়। আসলে যা মানুষদের জন্য ভালো সে কাজও করতে চাই। সত্যিই আমি বিশ্বাস করি, যেমন আমরা আলোচনা করেছিলাম—এ কাজ করলে মানুষে সমাজ, এই জীবন নিয়ে, এই চিন্তা, এই সবকিছুই আরো চিনবে। তাহলে পরিবেশ আর জীবন আরো সুন্দর হয়। আমরা তো জানতে পারি যে, আর কিছু আছে এই সংসারে। কিন্তু কি কি আছে? আর ওই দিকে আমার চিন্তা একটু থাকছে। ফলে গবেষণায় অবশ্যই থাকবো। পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমার আগ্রহ বাড়ছে। এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সেই 'যোগ-কলন্দার', তারপর শেখ জাহিদের 'আদ্য পরিচয়' নিয়ে আমি আরো গবেষণার কাজ করবো। আরেকটা দিক হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের তামিল দেশে এরকম তামিল যোগ-সাধনা, বিভিন্ন গুরু, আখড়া, আশ্রম—এরকম কিছু কিছু আরো কাজে লাগবে। বেশিরভাগ মানুষ এরকম গবেষণা করে না। খুব কম করে।

সাইমন: আজ এই পর্যন্তই। অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

কিথ: ভালো একটা ইন্টারভিউ হয়ে গিয়েছে। ধন্যবাদ।

সাইমন: জয় গুরু।

কিথ: জয়গুরু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৫শে অক্টোবর ২০২২। স্থান: সংস্কৃতি উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

খণ্ড ১৯, সংখ্যা ২৩
Vol. 19, No. 23

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

জুন ২০২৫
June 2025

doi.org/10.64242/bijbs.v19i23.8

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অনন্য এক পণ্ডিত টনি কে. স্টুয়ার্ট

টনি কে. স্টুয়ার্ট (জন রাসেল/ভ্যান্ডারবিল্ট)

Tribute

Tony K. Stewart, Eminent Scholar of Pre-Modern Bengali Literature and Culture

Abstract

Professor Tony K. Stewart (February 16, 1954 – October 6, 2024) was a towering figure in the study of pre-modern Bengali literature and culture–widely regarded as the rightful successor to Edward C. Dimock, who first integrated classical and modern Bengali literature into American academia. While many scholars explored specific literary epochs or traditions, Stewart distinguished himself by illuminating the syncretic spiritual and vernacular literary heritage of Bengal, particularly the domains of folk religion, Sufism, and Vaishnavism. His seminal works, including *The Final Word* : *The Caitānya Caritamrta and the Grammar of Religious Tradition* (Oxford, 2010) and *Witness to Marvels* : *Sufism and Literary Imagination* (California, 2019), reflect a lifelong commitment to understanding how sacred narratives and religious imagination shape Bengali texts. His editorial stewardship of Dimock's translation of the *Chaitanya Charitamrita of Krsndasa Kaviraja: A Translation and commentary* and his own masterful translations—*Needle at the Bottom of the Sea* : *Classic Bengali Tales from the Sundarbans* (2023), *Fabulous Females and Peerless Pīrs* : *Tales of Mad A dventure in Old Bengal* (2004), among others—have rendered Bengali voices audible to the wider world.

Stewart's devotion to Bangladesh extended far beyond scholarship. In 2006, he established the Bengali Language Institute in Dhaka, launching a U.S. State Department-funded CLS program that brought American students to immerse themselves in the language and culture of Bangladesh. Many of these students later pursued careers in academia or diplomacy, informed by their deep engagement with Bengali society. Stewart believed that while Bangladesh may be small in geography, it is vast in literary, cultural, and ecological wealth. His passing marks the end of an era, but his legacy endures – in every text he translated, every student he mentored, and every bridge he built between worlds.

টনি কে. স্টুয়ার্ট অনূদিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র

অধ্যাপক টনি কে. স্টুয়ার্ট (১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ – ৬ অক্টোবর ২০২৪) ছিলেন প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এমন একজন কিংবদন্তিতুল্য গবেষক, অনুবাদক ও সংগঠক, যিনি কিনা এডওয়ার্ড সি. ডিমক (১৯২৯-২০০১)-এর যোগ্য উত্তরসূরি। আসলে, এডওয়ার্ড সি. ডিমক-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি আমেরিকার একাডেমিক পরিসরে বাংলার ঐতিহ্যগত সাহিত্য-সংস্কৃতির পাশাপাশি আধুনিক সাহিত্যকে অন্তর্ভুক্তি করণে অবদান রাখেন। শুধু তাই নয়, প্রায় ৩৫ বছর ধরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কালে তিনি স্টুয়ার্টসহ অনেক পণ্ডিতকে বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্য গবেষণা উদ্বুদ্ধ করেন। তবে, ডিমকের প্রত্যক্ষ অনুসারী হিসেবে টনি কে. স্টুয়ার্ট সবার থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি তাঁর বহুমাত্রিক গবেষণার কেন্দ্রে স্থান দিয়েছিলেন লোকায়ত ধর্ম, দর্শন, সাধনা ও সংস্কৃতি নির্ভর বাংলা সাহিত্যকে। যেখানে আমেরিকান অধ্যাপক ক্লিনটন বি. সিলি (জন্ম: ১৯৪১) গবেষণা ও অনুবাদের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন আধুনিক কালের দুই প্রধান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও জীবনানন্দ দাশকে, ক্যারোল সলোমন (১৯৪৮-২০০৯) তাঁর গবেষণা ও অনুবাদ কর্মে গ্রহণ করেছিলেন গোবিন্দ দাসের *কালিকামঙ্গল* কাব্য, বাউল-ফকিরি ঐতিহ্য, লালন সাঁইয়ের গানের প্রামাণ্যপাঠ নির্মাণ ও ব্যাখ্যা, রেবেকা মানরিং গবেষণা ও অনুবাদ কর্মের জন্য নির্বাচন করেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ঐতিহ্য, অদ্বৈত আচার্যের সাধনজীবন এবং রূপরাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গল* কাব্য সেখানে তাঁর গবেষণা ও অনুবাদ কর্মকে বিস্তৃত করেছেন বিভিন্ন দিকে।

টনি কে. স্টুয়ার্ট একদিকে রচনা করেছেন *দ্য ফাইনাল ওয়ার্ড: দ্য চৈতন্য চরিতামৃত অ্যান্ড দ্য গ্রামার অফ রিলিজিয়াস ট্র্যাডিশনস* (অক্সফোর্ড ২০১০)। তার আগে হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজে প্রকাশিত এডওয়ার্ড সি. ডিমক অনূদিত *চৈতন্য চরিতামৃত অব কৃষ্ণদাস কবিরাজ : এ ট্রান্সলেশন অ্যান্ড কমেন্ট্রি* গ্রন্থটি প্রায় ২০ বছর ধরে সম্পাদনা করেন। অন্যদিকে তিনি ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত পীরপাঁচালী বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ *উইটনেস টু মার্ভেলস: সুফিবাদ অ্যান্ড লিটারেরি ইমাজিনেশন* (ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯) রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে তিনি উপর্যুক্ত গ্রন্থের বিশ্লেষণে ব্যবহৃত গল্পগুলি বিস্তৃত অনুবাদ প্রকাশ করেছেন *নীডল অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য সি : বেঙ্গলি টেলস ফ্রম দ্য ল্যান্ড অফ দ্য এইটিন টাইডস* (ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০২৩) গ্রন্থে। টনি কে. স্টুয়ার্টের অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে কবি চেজ টুইচেলের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহের পদাবলী'র অনুবাদ *দ্য লাভার অফ গড* (কপার ক্যানিয়ন প্রেস, ২০০৩), সুন্দরবন অঞ্চলের লোকায়ত নর-নারী পৌরাণিক চরিত্রনির্ভর আখ্যানের অনুবাদ *নীডল অ্যাট দ্য বোটম অব দ্য সি : ক্ল্যাসিক বেঙ্গলি টেলস ফরম দ্য সুন্দরবন* (স্পিকিং টাইগার, ২০২৪), হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে জনপ্রিয় সত্য পিরের আখ্যানের অনুবাদ *ফ্যাবুলাস ফিমেলস অ্যান্ড পিয়ারলেস পিরস: টেলস অব ম্যাড অ্যাডভেঞ্চার ইন ওল্ড বেঙ্গল* (অক্সফোর্ড ২০০৪)। এছাড়া, বাংলাদেশের লোকায়ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ে মৎ রচিত *প্রণমহি বঙ্গমাতা : ইনডিজিনিওস কালচারাল ফরমস্ অব বাংলাদেশ* গ্রন্থের ফরোয়ার্ড লিখে দিয়ে কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন।

বাংলার লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে যে সব পৌরণিক চরিত্র যুগের পর যুগ নর-নারীর সম্পর্ককে বর্ণনা করেছে, এমনকি হিন্দু-মুসলিম ধর্ম অনুসারী মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে সে সব দিকে টনি কে. স্টুয়ার্টের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর গবেষণা ও অনুবাদের সিংহভাগ এলাকা জুড়ে রয়েছে মুসলিম পীরপাঁচালী।

দুই

বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণে অধ্যাপক টনি কে. স্টুয়ার্ট ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ঢাকায় একটি ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ

ইনস্টিটিউট। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে এই ইনস্টিটিউট ঢাকায় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অর্থায়নে সমালোচনামূলক ভাষা বৃত্তি (CLS) প্রোগ্রাম চালু করে। তিনি এর প্রথম পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন শাখার (নৃবিজ্ঞান, কৃষি, আইন, চিকিৎসা, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস এবং আরও অনেক কিছু) আমেরিকান শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়। আমেরিকা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের এই প্রোগ্রামের আওতায় প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনা করতে হয়। পাশাপাশি স্থানীয় শিক্ষার্থীদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে ভাষিক দক্ষতা অর্জন ও বাংলাদেশের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের সুযোগ ঘটে। সেই সাথে ঢাকায় গ্রীষ্মের দশ সপ্তাহের সময় ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক আকর্ষণের স্থানগুলি পরিদর্শন করতে। এমনকি কেউ কেউ স্থানীয় এনজিওতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার জন্যও সময় খুঁজে পেত।

অনেকেরই পূর্বে বাংলা ভাষা বা বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে বাংলা ভাষা অধ্যয়ন চালিয়ে যান এবং অনেকেই একাধিকবার সিএলএস প্রোগ্রামে ফিরে আসেন। স্টুয়ার্ট নিশ্চিত করেছিলেন যে, প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সময় তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে, লেখক এবং শিল্পীদের সাথে, এমনকি বাউল গায়কদের সাথে একটি সন্ধ্যা কাটানোর সুযোগ পান। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত বাংলাদেশের জীবনের পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানতে পারেন। এই ছাত্রদের অনেকেই সময়ের সাথে সাথে আমেরিকান একাডেমি বা ফরেন সার্ভিসে পদ গ্রহণ করেছেন। বাংলা ভাষায় তাদের দক্ষতা এবং বাংলাদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তারা পেশাগত কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

টনি কে. স্টুয়ার্ট গভীরভাবেই অনুভব করেছিলেন যে, বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে ছোট হতে পারে, কিন্তু বাংলা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-প্রকৃতি ও ঐতিহ্যগত জ্ঞানের দিক দিয়ে বিশ্বে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আমাদের পর্যবেক্ষণ মতে, মহাত্মা অধ্যাপক টনি কে. স্টুয়ার্ট বিশ্বব্যাপী বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বাংলাদেশের তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য অনেকের চেয়ে বেশি কিছু করেছেন। এই মহাত্মা গত ৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে ৭০ বছর বয়সে তিরোধান করেছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।

—সাইমন জাকারিয়া

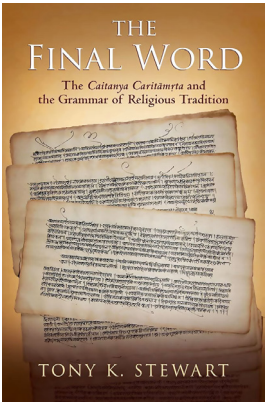

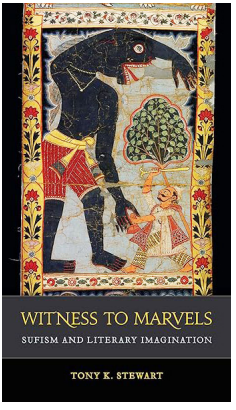

টনি কে. স্টুয়ার্ট রচিত দুটি গবেষণা গ্রন্থ–ফাইনাল ওয়ার্ড : দি চৈতন্য চরিতামৃত অ্যান্ড গ্রামার অব রিলিজিয়নস ট্রাডিশন এবং উইটনেসস টু মার্ভেলাস : সুফিজম অ্যান্ড লিটারারি ইমাজিনেশন-এর প্রচ্ছদচিত্র

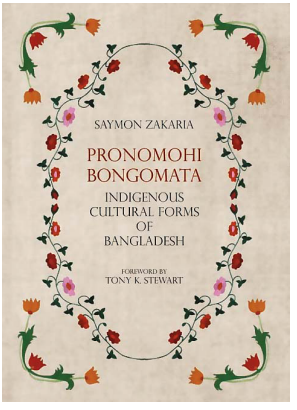

টনি কে. স্টুয়ার্টের ভূমিকা সম্বলিত প্রণমহি বঙ্গমাতা : ইনডিজিনিওস কালচারাল ফরমস অব বাংলাদেশ গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র

Notes On Contributors

Rebecca Manring is a Professor of Religious Studies at Indiana University Bloomington, where she also holds a joint appointment in the Dhar India Studies Program and serves as an adjunct member of the Department of Comparative Literature. She is a scholar of South Asian religions and literatures, with a particular focus on Middle Bengali texts and the Bengali Vaishnava tradition. She is currently preparing an annotated English translation of Rupram Chakravarty's 17th-century epic *Dharmamaṅgala* for Oxford University Press. This project, which sheds light on the lives and beliefs of ordinary people in early modern eastern India, is closely connected to her work with the annual Middle Bengali Reading Retreats, which she helps organize and where she regularly leads reading sessions on the *Dharmamaṅgala*. Her earlier research focuses on the Bengali Vaishnava community, resulting in two major monographs: *Reconstructing Tradition: Advaita Acarya and Gaudiya Vaisnavism at the Cusp of the Twentieth Century* (Columbia University Press, 2005) and *The Fading Light of Advaita Acarya* (Oxford University Press, 2011), the latter featuring her translations of key hagiographical texts. She also contributed to the preservation of the Sukumar Sen manuscript collection, producing a scholarly catalogue published in 2006. Manring's upcoming research explores sectarian Sanskrit grammars, such as the one composed by Jiva Gosvami for Bengali Vaishnava scholars. These grammars, modeled on Pāṇini's framework and infused with sectarian themes, were tools for both instruction and religious identity formation. She teaches courses in Sanskrit, women in South Asian religious traditions, religion in South Asian cinema, and Indian literatures in translation.

Dong Youchen (1937), known for his Chinese translations of the works of Rabindranath Tagore, is a recipient of various awards from India and Bangladesh for his contribution in translating Bengali literary works in Chinese and towards promotion of the

academic study of Bengali in China. Prof. Dong was a Professor at the Centre for Asia Studies, Beijing Foreign Studies University, China; and the Vice Director of the Literature- History College of the Party School of Central Committee CP of China. At present he is holding the position of Professor Emeritus at the Party School of Central Committee CP of China. He has authored the Chinese biography of Rabindranath Tagore and has edited a six volume Chinese translation of Rabindranath Tagore's poems. He is currently leading a 17 member team of translators engaged in translating the complete works of Tagore in Chinese in 24 volumes.

Eva Lekareva is a PhD student of Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences and an assistant at the Department of Indian Philology, Faculty of Asian and African Studies, Saint-Petersburg State University, Russia. Her academic interest lies in the field of Bengali literature, especially the reflection of the Indian liberation movement in Bengali literature, and some aspects of Bengali language. Her PhD dissertation is dedicated to the philological analysis of the poems comprising the anthology of the ancient Bengali manuscript "Charyagiti" and its translation into Russian.

Lu Mengqi, Bengali name শান্তি, female, from Anhui, China, head of Bengali Language Department, Guangdong University of Foreign Studies. She has attended the 18th Asia University Presidents Forum on behalf of the school and was named "Outstanding Undergraduate Tutor of Guangdong University of Foreign Studies" and "Outstanding Undergraduate Thesis Instructor of Guangdong University of Foreign Studies". She studied Bengali at the Communication University of China with a bachelor's degree, and graduated with a master's degree in foreign linguistics and applied linguistics from CUC. She is also a reserve talent for international journalism at the CUC. In 2018, as an intern reporter at the Asia-Pacific Center of People's Daily, she published more than ten signed articles in People's Daily and People's Internet. Many Chinese media reprinted her article.

Timothy Rice retired as professor of ethnomusicology at the UCLA Herb Alpert School of Music. He was born in 1945 in the USA. He is reputed for his special works on the traditional music of the Balkans, especially from the Slavic-speaking nations of Bulgaria and Macedonia. He has contributed a lot in the field of ethnomusicology in diverse ways, such as, editing the journal *Ethnomusicology* (1981 1984), acting as President of the Society for Ethnomusicology (2003 2005), and serving on the Executive

Board of the International Council for Traditional Music (2007-2013). He is the author of May it *Fill Your Soul: Experiencing Bulgarian Music* (Chicago, 1994) and *Music in Bulgaria: Experiencing Music, Expressing Culture* (Oxford, 2004) as well as numerous articles in major journals. In terms of research themes, he has written on musical cognition, politics and music, meaning and music, mass media, music teaching and learning, and theory and method in ethnomusicology, including a book entitled *Ethnomusicology: A Very Short Introduction* (Oxford, 2014). He was founding co-editor of the ten-volume *Garland Encyclopedia of World Music* and co-edited Volume 8, Europe.

Nurunnabi Shanto is a Bangladeshi short fiction writer, essayist, and translator. He is passionately involved in the activities of preservation of the Bangladesh's Intangible Cultural Heritage. His publications of short fiction include *Gramey Procholito Golpo* (2009), *Raasta* (2011), *Megher Oparey Akash* (2014), *Priyo Dusswopno (2016), Morar Matha* (2022), and *Khidmatul Mout* (2025). His collection of selected newspaper essays has been published under the title *Prantokotha*. Shanto is also the co-author of *Food Consumption of Baul Communities in Bangladesh–Towards the Goal of Zero Hunger*. As a translator, his works include *Interpreting Folklore* by Alan Dundes, *Call Me Brother* by Kate Day, *When Ganga Becomes Padda* by Kazi Khaleed Ashraf, and *The Songs of Monomohan Dutto*. He voluntarily serves as the honorary Executive Director of the Vabnagar Foundation.

Akhteruzzaman Elias, (1943-1997) novelist, short story writer of Bangladesh. Though not a voluminious writer, with only two novels and twenty-two short stories to his credit, Akhteruzzaman is considered as one of the foremost fiction writers of Bangladesh. His two novels are *Chilekotbar Sepai* (1987) and *Khoyabnama* (1996), while his short stories have been anthologized in *Anyaghare Anyasuar* (1976), *Khonyari* (1982), *Dudhbhate Utpat* (1985), Dojakher Om (1989). He also has a collection of 22 essays, Sangskrtir Bhanga Setu (1997), published posthumously. Elias' insight into the subtle nuances of human nature, his use of physical and psychological details, his keen sense of wit and humour, his sarcasm at hypocrisy, his critical knowledge of history and politics and its objective, aesthetic articulation in the novels and short stories have earned for him an eminent stature in Bangla Literature. Among the several awards Akhteruzzaman Elias received were Humayun Kabir Smriti Puraskar (1977), Bangla Academy Sahitya Puraskar

(1983), Alaol Sahitya Puraskar (1987), Ananda Puraskar (1996). Sa'dat Ali Akhand Puraskar (1996), Kazi Mahbubullah Gold Medal (1996), and Ekushey Sahitya Padak (1999, posthumous). Some of his works have been translated into several foreign languages. Chilekothar Sepai has been rendered into a film.

Matthew D. Rich, is a PhD candidate in Anthropology at the University of Chicago. He is in the final stages of writing his dissertation on language and national identity among the Khasi people of Northeastern Bangladesh based on 3 years of fieldwork in Maulvi Bazar, Sylhet. He is also at work translating Akhteruzzaman Elias's first novel, *Rooftop Soldier*, as well poetry from Binay Mazumdar's final volume *The Hospital Poems*. A translation of Elias's short story "*Renkor*", along with a substantial critical essay by Matthew on it, are currently under review by the journal Modern Asian Studies.

Keith Edward Cantú is a historian of religions whose interdisciplinary research especially focuses on South Asian yoga, tantra, and the interface between Sanskrit and Indic vernacular languages like Bengali, Tamil, and Hindi, and on modern occult movements in Europe and North America such as Thelema and the Theosophical Society. He is a Visiting Assistant Professor in Religious Studies at St. Lawrence University in New York and also teaches on the platform Yogic Studies. He was previously a research fellow at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in the Center for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences and Assistant Professor (postdoc) at the Jagiellonian University in Kraków, Poland on the project "Cultures of Patronage: India 1674–1890." He received his doctoral degree in religious studies in 2021 from the University of California, Santa Barbara, under the supervision of David Gordon White, and two master's degrees from the University of Washington.Keith's first monograph, *Like a Tree Universally Spread: Sri Sabhapati Swami and Śivarājayoga*, was published in 2023 by Oxford University Press (Oxford Studies in Western Esotericism series), and he is actively engaged in reprinting and translating several previously unknown or largely forgotten Tamil and Hindi works of Sri Sabhapati Swami and of his gurus. In addition to work on the swami, he is the author of numerous chapters and articles as varied as an ethnography of tantric songs and sādhana or "practice" in Bengali, Indological research on south Indian mantra and yoga practices at tumuli and temples and on the Sanskrit alchemical mythology of Srisailam, modern yoga and discourses of Orientalism and cultural authenticity, Haṭha

yoga as "black magic" in Theosophy, and Islamic esotericism in the songs of the Bāuls and Fakirs of Bengal. Keith is currently preparing a second monograph on the esoteric songs and music of the Bāuls of Bengal using methods from history of religions and ethnomusicology. As a musician, Keith regularly sings and performs the Bāul songs of the nineteenth-century Bengali humanist poet Lalon Fakir (Lālan Phakir, d. 1890) as well as Śyāmāsaṅgīt or "music for the dark goddess" (Kali), which he learned directly from sadhus and sadhikas during immersive stays in Bangladesh and West Bengal, India over the past twelve years. He also co-teaches a course on tantric meditation and its connection with this music at the Esalen Institute near Big Sur, California. English versions of many of Lalon's songs as translated by the late Carol Salomon can be found in *City of Mirrors: Songs of Lālan Sā̃i*, published in 2017 with Oxford's South Asia Research series, which Keith co-edited together with Saymon Zakaria, Deputy Director of the Department of Culture at the Bangla Academy in Bangladesh.

Saymon Zakaria is a prominent playwright of Bangladesh. He presented his plays at the University of Chicago, USA on 2012, and the SAARC Literature festival at Agra, India. The University of Chicago and Calcutta University received his plays for their academic curriculum. Among his original writings the Liberation War related play *'Shuru Kori Bhumir Naame* [In the name of our land]' was published in 1997 from the young writers' project of Bangla Academy. Some of his plays were published in distinguished literary journals of Bangladesh and West Bengal, India. His dance-drama *'Hritu-Obhijan* (The Journey of seasons)' was staged. His plays *A New Testament of Romeo and Juliet, Kobi (Poet), Bidogdho Danar Projapoti* (Metamorphosis), and *Molua* were staged as a part of producing plays in the Honours and Masters exams of the department of Theatre and Music of Dhaka University, the department of Drama and Music of Rajshahi University, and the the department of Theatre and Performance Studies of Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University. Besides, his plays *Na Noyramoni, Binodini, Shuru Kori Bhumir Naame, Molua, Proggaparomita, Kobi* and *Sitar Agniporikkha* were staged by Dhaka Theatre, Bodhon theatre (Kushtia), Shabdabali Group Theatre (Barishal), Shamakal Nattayachakra (Rajshahi), Ananda Nattaydal (Dhaka), Palakar (Dhaka) and Shadhana (Dhaka). Several of his plays were recently published in his *Natoksongroho* 1st and 2nd Volume [compilations of creative plays of Saymon Zakaria] Dhaka 2010). He is

internationally recognized for his ethnographic field-surveys that relate to Intangible Cultural Heritage. A scholar of Bangladeshi folklore, he wrote a doctoral dissertation titled "The Traditional Theater in Bangladesh: Content and Mode of Language". Besides writing plays, he has conducted ethnographic field surveys related to Intangible Cultural Heritage. He has delivered academic lectures on language, literature, and culture to the University of Chicago, the University of Pennsylvania, the University of California (Santa Barbara), the University of Washington, the Tokyo University of Foreign Studies, and the Sapientia-Hungarian University of Transylvania. Additionally, he has attended and conducted various workshops in Paraguay, France, Sri Lanka, Turkey, Kyrgyz Republic, Nepal, Philippines and different regions of India. He is currently Assistant Director of the Bangla Academy. His books include *Pronomohi Bongomata: Indigenous Cultural Forms of Bangladesh; Prachin Banglar Buddho Natok [The Buddhist Theatre in Ancient Bengal]; Bangladesher Lokonatok: Bisoy o Angik-Boychittra [Folk-Theatre in Bangladesh: Variation of Content and Phenomenon]*. He has co-edited, with Keith Cantu, Carol Salomon's *City of Mirrors: Songs of Lālan Sāi* (Oxford University Press, 2017). He received Bangla Academy Literary Award 2019. He is Deputy Director of the Bangla Academy in Dhaka, Bangladesh. Saymon Zakaria was born on 3rd December 1972 in Kushtia, Bangladesh.

BHĀBANAGARA
PEER-REVIEWED
INTERNATIONAL JOURNAL OF BENGAL STUDIES
VOLUME 19 • NUMBER 23 • JUNE 2025

ISSN 2313-6065